পুস্তক সমালোচনা

(১)

আকাশ-পাতাল—শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। মূল্য দুই টাকা।

তরুণ গ্রন্থকারের এই উপন্যাসখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। সমাজজীবনের যে স্তরকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার এই চিত্রটি আঁকিয়াছেন, আমাদের অনেকেরই সে স্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। গ্রন্থকারের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্য দিয়াই সে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিল। কলের কুলিমজুরদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লেখক সুনিপুণভাবে আঁকিয়াছেন। তাহাদের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাই। চরিত্র অঙ্কনের নিপুণতায় গঙ্গাবতীকে একেবারে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। সচরাচর বস্তিজীবন লইয়া যে সকল উপন্যাস লিখিত হইয়া থাকে ইহা সে শ্রেণিভুক্ত নহে। ইহার বাস্তবতা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আমরা তরুণ গ্রন্থকারের উন্নতি কামনা করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

কলেবর। শ্রীসুবোধ বসু। চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস। দাম ১।০।। কয়েকখানি ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার সবগুলিই 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তার হাস্যরস পরিবেশের সৃষ্টি করিবার সত্যকার ক্ষমতা তাঁর রচনাগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলেচে। কলেবর' নাটকটির মধ্যে সুমিতা চরিত্রটির অঙ্কন-চাতুর্য দেখিয়া বোঝা যায় লেখক নিপুণ শিল্পী।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বন্দিনী—শ্রীসুবোধ বসু। পরিবর্তিত সংস্করণ। দাম ১।০। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। মানবচরিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতার পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা তার কয়েকখানি গ্রন্থে পাইয়াছি। বর্তমান পুস্তকে দীপঙ্কর চরিত্রের অঙ্কনে তাহার সে খ্যাতি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। শুধু দীপঙ্কর বলিয়াই নহে—বধূরানী, প্রসন্ননারায়ণ, সঞ্চয় প্রভৃতি চরিত্রের প্রত্যেকটি জীবন্ত। পুস্তকের গল্পাংশটুকু চমৎকার।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[তিনটি পুস্তক আলোচনাই 'বিচিত্রা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় পত্রস্থ হয়েছিল।—নি.স.]

(৪)

THE KEY TO THEOSOPHY By, H. P. Blavatsky. Theosophy Company India Ltd. 51. Esplanade Road, Bombay.

This book is a cheap edition of H. P. Blavatsky's "Key to Theosophy", and an exact reprint of the original edition, first published in 1889. The book is an exposition, in the form of questions and answers of philosophy and ethics, for the study of which the Theosophical movement was publicly inaugurated in 1875. The introductory sections deal with the aims and objects of the Theosophical movement through its various branch societies as well as the nature of the fundamental teachings of Theosophy, both exoteric and esoteric, in their relation to nature and man. Deeper questions of life and death have been discussed with admirable lucidity and there has been an endeavour to present unfamiliar concepts in a form as simple and in a language as clear as possible.

(৫)

TWO STORIES. By H. P. Blavatsky, Theosophical publishing House, Adyar, Madras.

This little volume contains two short stories by H. P. B. whom we had not known as a writer of stories before we read this book. The first one “Karmic Visions” was first published in Lucifer, June, 1888, but was not signed by her, but by the word “Sanjna”. Lately this word has been identified as a pen name of hers. The second story “An unsolved mystery” was contributed to The Spiritual Scientist of Boston in 1875. Of the two stories this latter is more interesting and the skilled artistry of a born story-teller is manifest in every line of it. One hovers over a strange land of quaint imagination and quainter background as one goes on to open page after page, all concluded with an unexpected finale that invites one to think and to think deeply—an effect which is rarely achieved by magazine story-writers.

(৬)

TALES ON THE PATH OF OCCULTISM, By Annie Besant and C. W. Leadbeater. Theosophical Publishing House. Adyar, Madras.

The book under review is the third volume of the above series, its sub-title being "Light on the Path." With a view to facilitating the handling of the original book. "Talks on the Path," has been split up into three parts, and these are now issued separately. The book contains some rules of living a truth-seeking philosophical life, claimed to be based on an archaic sanskrit manusript and given to the world in its present form by the Master Hilarion, a great theosophical teacher belonging to the White Lodge, one who played a great part in the Gnostic and Neoplatonic movements. It also contains very elaborate exposition of the above apharisms by Chohan the Venetian, another great philosophical teacher, who added other sentences to these short rules and which now form part of the book.

The book is interesting reading and the important subjects it deals with awaken big thoughts in our mind-thoughts about the final destiny of Man, though it must be said, not being theosophists ourselves, we have to take many things on trust. We hope, however, the reading public will come to know from this book some of the inner teachings of Theosophy.

BIBHUTI BN. BANERJEE

(Modern Review August 1932, Book reviews P. 193)

আম-আঁটির ভেঁপুর মহলা

এক

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে।

বর্ষার দিন হইলেও আকাশ পরিষ্কার আছে। সর্ব্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ির কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল। অপু তাহার [পিছনে পিছনে] সঙ্গে সঙ্গে আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ি হইতে আসিল। ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া সর্ব্বজয়া ছেলেকে সঙ্গে দেখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে [ঘুরচিস] লাগলি কেন বল্ দিকি এমন করে? ঘরকান্নার কাজকর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না?—

অপু [আবদার মিশ্রিত ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিয়া] বলিল—তা হোক—কাজ তুমি ওবেলা করো এখন মা—তুমি যাও ঘাটে-পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য অতীব করুণ সুরে কহিল—আচ্ছা, আমার খিদে কি পায় না?—আজ ৪ দিন যে খাইনি?

[সে চারিদিন খায় নাই] একথা মিথ্যা নহে। তাহার অদ্য কয়েকদিন হইল জ্বর হইয়াছিল। অদ্য সে পথ্য করিবে। অসুখের সময় শুইয়া শুইয়া কয়দিন কেবল সে নানারূপ খাদ্যদ্রব্য খাইবার কল্পনা করিয়াছে। সোনামুগের ডাল ও আলুভাতে, বেগুনভাজা, পালিতদের বাগানের পাকা কামরাঙা, কুলের আচার, মানকচুর ডাল্না, ..ইত্যাদি.. বরবটি দিয়া বড়িচচ্চড়ি ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাহার খাইবার ইচ্ছা দাঁড়াইয়াছে পল্তার বড়া ভাজার উপর। কয়দিন সে শুইয়া শুইয়া দিনরাত মনে মনে পল্তার বড়া ভাজা দিয়া মুঠা মুঠা শুকনা ভাত খাইয়াছে—কখনো বা মুগের ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া পলতার বড়া দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়াছে। এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে কলাইয়ের ডাল কখনো খাইতে ভালোবাসে না—কিন্তু গত কয়েকদিন তাহার মনে হইয়াছে ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া যদি পল্তার বড়া দিয়া খাওয়া যায়, তবে তাহার মতো সুখাদ্য পৃথিবীতে তাহার এই [আট] সাত বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে আর কখনো খায় নাই। রাত্রে শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে যে সে পল্তার বড়া ভাজা দিয়া ভাত খাইতেছে। বলিয়াছে—কিন্তু সেরে গেলে আমি পল্তার বড়া ভাজা দিয়া ভাত খাবো—হুঁ—কেমন তো মা?—ভাত সে সাধারণত খাইতে চাহে না এবং খাইতে ভালো করিয়া পারেও না, খাইতে বসিয়া ফেলে ছড়ায়। সর্ব্বজয়া খাওয়াইয়া না দিলে তার কোনোদিন পেট ভরে না—কিন্তু [গত কয়েকদিন মনে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে যে ইহা কি সত্য যে সেই ভাত খাইতে তাহার এতদিন ভালো লাগিত না।] বোধ হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াই উহারা অপুর স্বপনে পাছু পাছু আসিতেছে—বর্তমানে যে কলায়ের ডাল ভাত ও পল্তাভাজা দিনেরাতে শয়নে স্বপনে তাহার পাছু পাছু ফিরিতেছে।

আজ সকাল হইতে উঠিয়া সে মায়ের পিছনে পিছনে তাগাদা করিয়া ঘুরিতেছে, সকাল সকাল ভাত চড়ানো হউক, ঘরকন্নার কাজ তো রোজই [ঝাঁট দেওয়া] হয়, একদিন কি বাদ দিলে চলে না?—বাসনও তো রোজই মাজা হয়। আজ হয় নাই হইল—ইত্যাদি। কিন্তু মায়ের সংকল্প টলিবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিয়াছে, তাহার মনে হইতেছিল মায়েদের মতো হৃদয়হীন পাষাণ জীবজগতে আর কয়টা আছে? সে মাঝে মাঝে হতাশামিশ্রিত করুণসুরে মায়ের মন গলাইবার চেষ্টা করিতেছে—আচ্ছা বলো দিকি মা, আমি ক-দিন আজ খাইনি?—আমার খিদে কি পায় না?—তাহাতেও সুবিধা করিতে না পারিয়া সে মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না—যাক বাসন মাজা উঠান ঝাঁট সব—

সর্ব্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—খিদে পেয়েচে তার জোগাড় তো চাই, বসে তো নেই—ছিষ্টির কাজ নিজের হাতে কোরবো তবে তো হবে? [মাণিক আমার, সোনা আমার—]—আর একটুখানি সবুর করো—এই যে হয়ে গ্যালো—ঘাটে যাবো আর ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দেবো—ওরকম কি দুষ্টুমি করে—ছিঃ—কখানা পল্তার বড়া ভাজা খাবি?—[বল তো?—ছখানা?] পলতার

দুই

কলা, গুড়, তাহাদের খাইতে দিল।

[সে ভালো করিয়া মাখিতে পারিতেছিল না, চারিদিকে ফেলিতেছিল, ছড়াইতেছিল। তাহার বাবা বলিতেছিল—ভালো করে মাখো—ফেলো না—দুধটা সবটুকু ঢেলে নাও—বেশ ভালো দুধ—]

একঘর লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের খাওয়া দেখিতেছিল বলিয়া তাহার ভারী লজ্জা হইতেছিল। মাঝে মাঝে সে কিন্তু মহা খুশির সহিত লক্ষ করিতেছিল যে তাহার গায়ের সেই সার্টিনের জামাটা লোকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। কেবল খাইতে বসিয়া তাহার দিদির জন্য তাহার মন কেমন করিতেছিল—[সে কিছুই] দিদি ভালো জিনিস খাইতে পায় না—এরকম ফলার সে বাড়িতে কোনোদিন চক্ষেও দেখে নাই—[খাইতে খাইতে বার বার তাহার মনে হইতেছে] দিদি থাকিলে ভারী সুন্দর হইত—অপুর মনে দিদির জন্য কষ্ট হয়—সেবার খেজুরের সময় দিদি ছোট্ট এক কাঁদি ডাঁসা খেজুর তক্তপোষের তলায় কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছিল—পাকিলে খাইবে। তাহাকে দিদি বলিত—[ওরে অপু, কাল সকালে খেজুর ঠিক পাকবে দেখিস—আজ গন্ধ বেরুচ্চে কেমন না? পরে সে খুশিতে আকুল হইয়া বিছানায় ছটফট করিত—সকাল হইলে]।

অনেক রাত্রে (তাহার দিদি] তাহাকে ওঠাইয়া বলিল—অপু, জেগে আছিস নাকি?

একটু আগেই তাহার ঘুম ভাঙিয়াছিল, সে বলিল—বড্ড মশা কামড়াচ্চে—

তাহাদের মশারী নাই—আগে ছিল, পুরানো হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে—আর নতুন কেনা হয় নাই।

দিদি বলিল—ওরে অপু, খেজুরের কাঁদি কাল সকালে ঠিক পাকবে, দেখিস—চৌকীর তলা থেকে গন্ধ বেরুচ্চে—নারে? [—হি-হি-হি।]

খুশিতে অস্থির হইয়া [সমস্ত রাত] তাহার ঘুম আসিল না। তাহার দিদি ঐরকম; পুতুলের বাক্স ভরিয়া পাকা সেওড়া ফল, তেলকুচা ফল রাখিয়া দেয়—যাহা আর কেউ খায় না, তাহা সে লিপ্সার সঙ্গে খায়। শিষ্যবাড়ি গিয়া ভালো খাওয়া হইলেই—কতদিন বড় মাছভাজার কাঁটা বাছিতে বাছিতে—কি ঘন দুধের বাটিতে কলা মাখিবার সময়—দিদির কথাই তাহার মনে পড়ে। সে বাড়িতে থাকে। তো কি করিয়া ভালো খাবার পাইবে? [অপুর একটা কথা মনে হয়।] আর সকলেরই বাড়িতে ভালো খাবার খায়। তাহাদের বাড়ি কেন হয় না?

দিদি ভালো খাইতে পায় না, দিদির ভালো কোনো খেলনা কি পুতুল নাই—এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বিদেশে গিয়া তাহার বেশি করিয়া মনে হইয়াছে। বড় হইলে সে দিদিকে অমলাদিদির মতো বড় বড় পুতুল, ঐরকম একটা বড় সোলার ময়ূর কিনিয়া দিবে।

ভ্রমণের মধ্যে অপুর সকলের চেয়ে ভালো লাগিয়াছে বড় বড় মাঠ ও সেই পদ্মফুলে[র] ভরা বিলটা। আকাশের ওরকম রং সে আর কখনো দেখে নাই। তাহাদের [গ্রামের] গ্রামটা বাঁশবনে, আমবনে, গাছপালায় এত চাপা যে খোলা আকাশের সহিত অপুর এতদিন পরিচয় হয় নাই। কিন্তু পথ বাহিয়া যাইবার বৃষ্টিধৌত, নির্ম্মল, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার, খলসেমারি বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ উড়ি ও আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার আকাশে সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, ধূসর, পীত, ফিকে-নীল, ফিকে পাটকিলে, কত কি রং-বিরংয়ের মেঘের পাহাড়, মেঘেরদ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—মেঘরাজ্যের এই মায়ারূপ তাহাকে মুগ্ধ [করিয়াছে] করিল। সে এরকম আর কখনো দেখে নাই। একবার যাহা দেখিয়াছিল—তাহা কখনো ভোলে নাই।

এই আকাশ দেখার জন্য খুব ছেলেবেলায় ভারী আগ্রহ ছিল। তখন তাহার বয়স একবৎসর (অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থিরপ্রকৃতির ছেলে—এদিকে খলবল করিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে, ওদিকে একবার যাইতেছে, কখন কোনদিকে আছে ঠিক নাই, কখন বা দাওয়া হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গে, দুর্গাও তখন খুব ছোট] তাহার মা

তাহাকে বাকারীর বেড়ার মধ্যে আটকাইয়া রাখিত। ঝুপসি বাঁশবাগানে ঘেরা বাড়িটার মধ্যে সারাদিন আবদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া তাহার কি মনে হইত সেই জানে।

একবার তাহার মা তাহাকে কোলে করিয়া রায়েদের পুকুরের পাড়ে লইয়া গিয়াছিল। সেখানটা বনবাগান নাই, বেশ ফাঁকা। খোকা সেখানে যাইবা মাত্র কেমন যেন বুঝিতে পারিল যে আজ অন্যদিনের মতো নয়—আজ একটা নতুন কিছু ঘটিয়াছে। পরে [খোকা] সে যেন এদিক ওদিক চাহিয়া কারণটা অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ ক্ষুদ্র হাতটি উঁচু দিকে তুলিয়া বার বার বলিতে লাগিল—জি-জি-জি-জি-জি! তাহার মা দেখিল খোকা রাঙা রাঙা ফুলা গালে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ফাঁকা আকাশের দিকে চাহিয়া আছে—সে কেমন একটা দেখিতেছে, যাহা দীর্ঘ এক বৎসরের পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় কোনোদিন সে দেখে নাই—যদিও একটিমাত্র বৎসর আগে শিশু পথিকটি ওই অনন্তের পথ বাহিয়াই কোথা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বটে।...

সে মায়ের আঁচল টানিয়া বার বার ওপরের দিকে হাত তুলিয়া দেখাইতে লাগিল জি-জি-জি! জি-জি-জি! [নির্বোধের মতো উপরদিকে চাহিয়া রহিল।] চলিয়া আসিবার সময় খোকা মাকে ছোট্ট পা দুখানি আকঁড়াইয়া ধরিয়া যেদিকে পুকুরের ফাঁকা পাড়টা পিছনে পড়িয়া রহিল, সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার বলিতে লাগিল—জি-জি-জি, জি-জি—।

শিশুর ভাষা তাহার মা বুঝিল, বলিল—না, না, আজ আর জি জি না—আবার কাল জি জি হবে এখন—[মাঝে মাঝে সে একবার করিয়া খোকন আমার সোনা আমার]—আহা বাছা আমার সারাদিন ধরে ঝুপসিটার মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে ওঠে—ফাঁকায় এসে আজ বাঁচল—আবার একদিন আসবো—চল—পরে সে খোকাকে আদর করিতে লাগিল—আমার খোকন সোনা—চাদের কোণা—কলসী কলসী ঘি—আমার খোকনের বিয়ে হোল না ছি ছি ছি—কেন বল দিকি—খোকন তোমার বিয়ে হোল না ! তখনই আবার নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিল—হবে, হবে, খোকনের আমার যখন বিয়ে হবে...

তিন

(ক)

...এই সবে ডাল নামলো—কতদিকে যাবো—এই তো এলাম নেয়ে—ভালো কথা (মা), দুগ্‌গা—একটা কাজ কর্‌বি, লক্ষ্মীটি?

—কি বলো ..[না খুড়িমা?]

—এ মাছগুলো মা যদি একটু কুটে দিস্—একা আর পারিনে—

–আচ্ছা দিচ্চি, তোমাদের আঁশ-বটি কোথায় খুড়িমা?

—আঁশ-বটিখানা? দ্যাখ দিকি মা বোধ হয় রকের ধারে আছে, না হয় তো গোয়ালের বাইরে চালের বাতায় দ্যাখ দিকি, বোধ হয় গোঁজা আছে—

মাছ কুটিতে কুটিতে দুর্গা বলিল—হ্যাঁ খুড়িমা, এ কাঁকড়া [কি কিনলে..] কোথায় পেলে?—এ কাঁক্‌ড়া তো খায় না—

—কেন খাবে না রে? দূর! বিধু বলে গেল এ কাড়া সকলেই খায়—

—"হ্যাঁ খুড়িমা, ওমা সেকি, একি তুমি কিন্‌লে?"

—"কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো কাঁক্‌ড়া ৫ পয়সায় দিয়েচে...

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল, খুড়িমার আর সব ভালো, কেবল একটু বোকা। এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনে কে? [তাহার কথা জেলে] খায়ই বা কে? ভালোমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েচে! সে কি কম বদমায়েস! সঙ্গে সঙ্গে সরলা খুড়িমার ওপর হঠাৎই তার অত্যন্ত একটা স্নেহ [আসিল] হইল...সেদিন স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়িতে গিয়া গল্প করিয়াছিল যে গোকুলকাকা [মাংস ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া] খুড়িমার মাথায় এমনি নাকি খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল যে রক্ত জমাট হইয়া চুলের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল... [সেদিন] নদীর ঘাটে সে-ও সেদিন স্নান করিতে গিয়াছিল...দেখিয়াছিল খুড়িমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না...পাছে জ্বালা করে...খুড়িমাকে সে বরাবর বড় ভালোবাসে..খুড়িমা প্রায়ই প্রায়ই গোকুলকাকার হাতে মার খায়। তাহা সে জানে..খুড়িমার মাথায় চুলে লেপ্টানো জমাট রক্ত দেখিয়া সেদিন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল..কিন্তু কিছু বলিতে পারে নাই..পাছে খুড়িমা অপ্রতিভ হয় কি একঘাট লোকের সামনে লজ্জা পায়। রায়জেঠী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বৌমা, নাইলে না? খুড়িমা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল,—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা তেমন ভালো নেই...খুড়িমা বুঝি ভাবিয়াছিল তাহার মারের কথা কেহ জানে না...কিন্তু খুড়িমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠী বলিল—দেখেচো গোকলো কিরকম ঠেঙিয়েচে দেখেচো মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁটে গিয়েছে...তাই লইয়া ঘাটের সকলে কত ধরনের কত কি কথা বলিয়াছিল... [কেহ হাসিয়াছিল] রায়-জেঠীর ভারী অন্যায়!...জাননা তো বাপু, তবে আমার (আবার?) জিগ্যেস করাই বা কেন আর সকলকে বলাই বা কেন? আর স্বর্ণ গোয়ালিনীই তো যত নষ্টের গুরুমশায়, সেই সেদিনকার কথা সব পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়াছে। খুড়িমার প্রতি করুণ স্নেহে দুর্গার বুক ভরিয়া চোখে জল আসিল...মাকে সেদিন সে বাড়ি গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মা, [চুন-হলুদে কি পাথরকুচির পাতা বেটে] যা কিসে শীগগির শুকোয়?...তাহার মা বলিয়াছিল পাথরকুচির পাতা নুন দিয়ে হুঁকোর জলে বেটে দিলে সেরে যায়... একবার সে ভাবছিল [পাথরকুচি পাতা] ঔষধ বাটিয়া লইয়া [গিয়া এবং] ছুটিয়া গিয়া খুড়িমার মাথার পটি বাঁধিয়া দিয়া আসে...অনেকবার আসি আসি করিয়াও আসিতে পারে নাই [শুধু এই জন্যে যে] তাহা হইলে সকলে টের পাইয়াছে ভাবিয়া হয়তো খুড়িমা বড় লজ্জায় পড়িবে... [দরকার নাই]... খুড়িমাকে তাহার বড় ভালো লাগে... তাহার মতো ভালো মানুষ... মুখে কথা নেই.. দুর্গাপ্রতিমার মতো সুন্দর...এত

(খ)

[বধূ নীচে নামিয়া গেল।]

নির্জন দুপুরে উঠানের ধূলাকুটায় ছোট ছোট ঘূর্ণী সৃষ্টি করিয়া হাওয়ার দমকা বহিতেছে। চালের ওপর একটা বিড়াল উঠিয়া থাবা দিয়া খড় খুঁচাইতেছে। সামনের কচি পাতা-ওঠা বাঁশবনগুলোর মাথায় অপর পারে ধোঁয়া ধোঁয়া রদ্দুর ভরা আকাশটা নীল, একেবারে ঘন নীল—ছেলেবেলায় তাহাদের উঠানের দোপাটি বাগানে সে ও হিমিদি কেমন গাছে জল দিত—বিয়ের আগের সে দিনগুলা...ভাবিতেও মনের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে...হিমিদিরও বিয়ে বাপের বাড়ির পাশের গাঁয়েই *** সে-ও *** মেয়েমানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যখন তখন গালবকুনি অপমান তো অঙ্গের আভরণ আছেই। ভাই-এর কথা মনে পড়িল। সামান্য একখানা গায়ের আলোয়ানের জন্যে শ্বশুর তাহাকে কি অপমানটাই না—জানো বাপু, তুমি কুটুমের ছেলে, এসেচ কুটুমের মতো থাকবে তা না এসব ছোট লোকের মতো ব্যাভার—তোমাকে আর বাড়ি রেখে বিশ্বাস করা যায় না তো বাপু? পিস্‌শাশুড়ি বলিলেন—কুটুম্ না ছাই, যত ছোটলোকের বংশ—ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় কর্ত্তে হয় বাড়ি থেকে—

ভাইটা মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া ময়লা ছেড়া কাপড়ের পুঁটুলিটা লইয়া দুপুর বেলা সেই যে কোথায় বাহির হইয়া গেল আর কোনো খোঁজখবর নাই আজ তিন বছর। সামান্য একখানা গায়ের কাপড়ের মাম্‌লা—ছ আনা দাম।

খানিকক্ষণ অন্যমনে বাঁশঝাড়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে হঠাৎ চোখের জলে আকুল হইয়া উঠিল—কেউ কোথাও নেই যে সংসারের খাটুনি থেকে দুদিন কোথাও গিয়ে থাক্‌বো—এমনি করেই ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন কাটাতে হবে—দুঃখু বোঝে এমন কেউ নেই। মা বাবা যেদিন মারা গিয়েচে—সেদিনই সব গিয়েচে—

বৈকালে অপু নীরেনের কাছে আসে। সে প্রায়ই নীরেনের কাছেই থাকে। তার সঙ্গে সকালে চা খায়। বৈকালে তার সঙ্গে খাবার খাইয়া বেড়াইতে যায়। নীরেনের বই-এর ছবি দ্যাখে—তাহাতে কাপড়চোপড়ে সাজিমাটির গন্ধ নীরেনের বড় ভালো লাগে—আজকাল অনেকসময় এখানে থাকে বলিয়া তাহার মা সাজিমাটি দিয়া কাপড় দুতিন দিন অন্তর কাচিয়া দেয়। অপুর কাছে সকলে ছড়া শোনে, গান শোনে, তাহা নীরেন জানে—বলে—খোকা সেই ছড়াটা বলো তো?—সেই মশারির সেইটে—

অপু প্রথমটা একটু হাসে পরে একটু ভাবিয়া মুখ তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করে—]।

(গ)

[—মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে—নাঃ বৌদি আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে—

পাড়াগেঁয়ে আছিই তো তা শহুরে হই আর কি করে বলো না—যেখেনে মানুষ সেখানকার মতোই তো—

—আচ্ছা আপনি রেলগাড়িতে কতদূর গিয়েছেন বৌদি?

বধূ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল—চোখ দুটি প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ ভারী দূর গিইচি—একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি—সেই ওবছর পিস্‌শাশুড়ি আর ওপাড়ার সতুর মার সঙ্গে যষ্টি মাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম সেই আমার বেশিদূর যাওয়া—

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তার চারিপাশে এমন একটা হাসি কৌতুকের জাল বুনিতে পারে, যা নীরেনের ভারী ভালো লাগে। এক একজনের মনের মধ্যে আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে। তাহারা যেখানে যায় তাহাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস কারণে অকারণে মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে—এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে। সে আসিলে মনে হয় অন্য কাজ থাক—একটু কথাবার্তা বলি— না আসিলে মনের মধ্যে যেন একটু নিরাশা এমন কি একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে সে ভাবে বৌদি না থাকলে এই পাড়াগাঁয়ে কি আর দিন কাটতো?

—আচ্ছা বৌদি আপনাদের সব্বাইকে চলুন একবার পশ্চিমে সব নিয়ে বেড়িয়ে—

—তা আর হয়েচে! এ বাড়ির লোক আবার বেড়াতে যাবে পশ্চিমে—তুমিও যেমন ঠাকুরপো?...তা হলে উত্তর মাঠের বেগুন ক্ষেত চৌকী দেবে কে?

কথার শেষে বধু আর এক দফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার পড়াশুনো আর কদ্দিন বাকি—আর কবছর লাগবে পাশ দিতে?

এদিকটার পথঘাট গভীর কুয়াশায় ভরা তাহার কাছে বধু আর বেশি অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। নীরেন বলিল—এখনো বছর দুই তো খুব—

—দুবছর!...আচ্ছা একটা কথা রাখবে আমার ঠাকুরপো?

—কি কথা বলুন—

—যদি রাখো তো বলি—

—বারে, সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি, আমরা আইন পড়ি—আগে কথাটা কি শুনবো তবে আপনার কথার উত্তর দেবো—

—বিয়েথাওয়া করবে কি না?

—কেন বলুন তো? ঘটকালি বুঝি! দেখুন বৌদি আমরা ওকালতি পড়ি-কথা পড়লেই বুঝতে পারি কোন কথার কোন দিকে গতি—চোখে ধুলো দিতে পারবেন না বুঝলেন?—হঠাৎ নীরেন্দ্র বলিয়া উঠিল—বৌদি—আপনার বাঁ দিকের কানের ওপর কেটে গিয়েচে কি করে? দেখি দেখি অনেকটা যে—

বধূর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল—তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ও কিছু নাঃ—

—কিছু না বল্লে শুনবো কেন? দিব্যি কেটে গিয়েছে— দেখি বৌদি?

—কি আবার দেখবে? ও কিচ্ছু না—পরে একটু ভাবিয়া বলিল—এই কাল ঘাটের কানায় উঠতে যাচ্চি তাই পা পিছলে—হাত তুলিয়া কথিত স্থানটিতে হাত বুলাইয়া বলিল—এই জায়গাটা কেটে গেল—সত্যি—আচ্ছা যাই এখন ঠাকুরপো নীচে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে]

চার

18.2.26. Bha

To be preceded by a chapter of pure narration.

২৮-৮=২০

ফাগুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইলেও শেষরাত্রিতে এখনো বেশ শীত পড়ে। দুর্গা ও অপু শুইয়া আছে, ভোর [হইয়া] হইলেও উঠে নাই। সর্ব্বজয়া উঠিয়া উঠানে ঝট দিতেছে। তাহার ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাইতেছে। *** উঠিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য দুর্গা শিয়রের জানালা খুলিয়াছিল, আর বন্ধ করে নাই, খোলা জানালা দিয়া [ভোরের হাওয়ার সময়] ঝিরঝির করিয়া [ভোরের] প্রথম সকালের বাতাস বহিতেছে, নীলমণি রায়েদের ভিটায় যে বাতাবীলেবুর গাছ আছে, তাহা হইতে ফুটন্ত লেবুফুলের মিঠা গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে [মিশিয়া] ভাসিয়া আসিতেছে। দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপুও—অপু—

অপু জাগিয়া ছিল বটে কিন্তু সে এখনো [সাড়া দেয়] পর্য্যন্ত কোনো কথা বলে নাই। উত্তর দিল—[কি রে? দিদি?] দিদি, জানলাটা বন্ধ করে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে—

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—

—[দোল] রাণুর দিদি (রে) বিয়ে কবে জানিস? [দোলের] কিন্তু আর বেশি দেরী নেই—

—কবে [দোল দিদি রে] বিয়ে রে? [দিদি জান্‌লাটা বন্ধ করে দিবি?বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে-[দুর্গা জানালা বন্ধ করিয়া দিল।]

কাল রাণুর কাকা বলছিল [দোলের] বিয়ের আর বেশি দেরী নেই—পরে সে অত্যন্ত খুশির সহিত ভাই-এর গায়ে হাত দিয়া কহিল—এবার দেখিস কেমন লুচি খাবো আমরা বিয়ের নেমন্তন্নে—আর বছর সেই খেলাম, ওপাড়ার উমাদিদির বিয়েতে তুই, আমি, সতু।—আর বেশিদিন নেই—রাণুর কাকা বলছিল—শীগগির বিয়ে হবে, দিন ঠিক হয়ে গিয়েচে।

—আচ্ছা, আমাদের যদি নেমন্তন্ন না করে? [দিদি?]

দুর্গা উঠিয়া বসিয়া বলিল—দূর করবে না কেন রে? [সব বারই তো করে—এবারও করবে] করবে, ঠিক দেখিস ***** এবার তুই আর আমি যাবো?***

সর্ব্বজায়া ঘরে কি কাজে ঢুকিয়াছিল—কেবল খাবার গল্প আর খাবার গল্প—উঠে ততক্ষণ বাছুরটা ধর না কেন? [ধাড়ি মেয়েকে দিয়ে যদি কোনো কাজের আসান আছে? সকালবেলা কাকপক্ষীতে এখনো জাগেনি—খাই-খাই—অলুক্ষুণে যত বালাই এসে জুটেছে আমার ঘাড়ে—]

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। আজ তাহার মনটা খুব খুশি। খুশির প্রথম কারণ সকাল হইতেই তাহার মনে হইয়াছে—[দোলের] রাণুর দিদির বিবাহের নিমন্ত্রণের আর বেশি দেরি নাই। দ্বিতীয়, কাল রাত্রে মা ও বাবার কথাবার্তা সে শুইয়া শুইয়া শুনিয়া লইয়াছে। সে ঘুমায় নাই। মশা লাগায় তাহার ঘুম হইতেছিল না। সে সমস্ত কথা শুনিয়াছে। নীরেন বাবুর সহিত তাহার বিয়ের কথা হইয়াছে। [একথা লইয়া খুড়িমাও একদিন তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছিল বটে। হইলে—তা মন্দ কি?]

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ির কাজ তবুও যা হোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। রাত্রের বাহির করা বাসনের মধ্যে দুটা বড় বড় ঘটি ও অপুর ছোট্ট থালা ও গ্লাসটা মাজিয়া রাখিয়া সর্ব্বজায়া যেমন জল আনিতে চলিয়া গেল, অমনি সে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর..সকালটা না গরম ঠাণ্ডা..কেমন মিষ্ট লেবুফুলের গন্ধ আসিতেছে, যেন একটা কেমন মনে হইতেছে..কি তাহা সে বলিতে পারে ..তবুও মনে হইতেছে—বেশ কেমন যেন। কত কি চারিধারে যেন ছড়ানো রহিয়াছে—কত শুকনা বকুলবীচি, কত নাটাফল, কত ঘেঁটুফুলের ঝাড়-খেলাঘরে দুলাইবার জন্য—বেশ ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার করা মাটির পথে, বাঁশবনের ছায়ায় কত খেলাধুলা—আজকার দিনটা ঝোপের ধারে ধারে বেড়াইবার, ওড়কলমীর নলক খুঁজিয়া পরিবার, চিনিবাসের দোকান হইতে কিনিয়া আলতা পরিবার দিন।

বাহির হইয়া সে মহা উৎসাহে রাণুদের বাড়ি গেল। [উঠানে রাণু, সতু, নেড়া আরো কত ছেলেমেয়ে জুটিয়াছে] ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, এই প্রথম মেয়ের বিয়ে। খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। [কাজেই] নবাবগঞ্জ হইতে বাজীওয়ালা আসিয়া বাজীর দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ এ অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে। তাহার বায়না হইয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্ব কুটুম্বিনী আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ির উঠান সবসময় সরগরম! ভুবন মুখুয্যে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আষাঢুর চৌধুরী বাটী হইতে সামিয়ানাটা আনাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাঁহার ৩/৪ জন প্রজা উঠানের এদিকে ওদিকে কেহ বাঁশ পুঁতিতেছে, কেহ [কোনখানে]।

পাঁচ

বর্ণনাবলী Bha 20.2.26

বনে পুষ্পসুরভিতে বৈকালের ছায়া শান্ত; চৈত্র মধ্যাহ্নের তপ্ত বাতাস লেবুফুলের গন্ধ ভরা। ছায়াকীর্ণ মাটির পথে বনঝোপের মধ্যে মধ্যে পাখির দল কিচকিচ কচ্ছে| করিতেছে। নদীর ধারের আম্রকুঞ্জ কচি বউলের অলস, মিষ্টগন্ধে শিথিলপত্র, আবেশাতুর—যেন জগতে আর কোনো কাজ নাই, অথবা কিছু করিবার আবশ্যক নাই—দীর্ঘ, স্বপ্নময় দিনগুলি ধীর, অলসগতি গ্রাম্য নদীর ছোট ঢেউগুলির মতো চোখ বুজিয়া জীবনের পথে ভাসিয়া যাইবে আপনা আপনিই, সেজন্যে কারুর কোনো মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই,—পথিক-জীবন তার নিজের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেই, কে তুমি, যে তার জন্য খাটিয়া মর? মাঠের মধ্যে শেষ প্রহরে রাতে যখন কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর জ্যোৎস্না

ফোটে, ফাল্গুনদিনে ঘেঁটুফুলের ঝোপ-মাঠের মাঝের উঁচু ডাঙা আলো করিয়া রাখে, গ্রামসীমার প্রাচীন সপ্তপর্ণ তরুর পুষ্পিত শাখা গন্ধ-ভরা। বাতাসে [আন্দোলিত] দুলিয়া উঠে—তখন শুধু চোখ পুঁজিয়া মাঠের ধারের রৌদ্র-[ঘেরা] শীর্ণ পীত দূর্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে ভাবো নতুন পাতা গজানো বৈঁচি ঝোপের মধ্যে [গা লুকাইয়া বন-অপরাজিতার ফুটুক] খরগোস খস্‌খস্‌ শব্দে বাধাশূন্য হউক, পুষ্পস্তবকাভিনম্র বন-অপরাজিতা লতা যে নির্জনে তোমার একমাত্র সঙ্গিনী হউক।

পথের শেষে যেখানে গ্রামের মেয়েদের নাইবার ঘাট, নাগকেশর ফুলের [শ্যামোজ্জ্বল] শ্যামসুন্দর শাখাটি নত হইয়া [তাহাদের] ওদের ঘাটের ধারটির উপরে যেখানে ছায়া করিয়া আছে, যে পথের বুকে বুকে তরুণী গ্রামবধূদের সিক্ত চরণচিহ্ন আঁকা-জলের যে আলপনা লক্ষীর মতো চঞ্চল ও নিত্য,—ফাল্গুন-চৈত্রের গন্ধভরা ছায়াভরা স্নিগ্ধ সায়াহ্নে [বন্যরক্তকুঁচ] রক্তকুঁচের কাটায় ফুল ফোটে, বন্য পক্ষীরা যেখানে কাটায় পাখা আটকাইয়া ছাড়াইবার জন্য আকুল হইয়া পাখা আছড়াইতে থাকে—সেখানে শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও;

নীলশূন্যে, [অনন্তের পথে] এখানে ওখানে যেসব পাটকিলা রং-এর মেঘদ্বীপ,—তারই পিছন দিয়া—অনন্তের পথ, গভীর রাত্রে, বিজন মাঠে শেষ প্রহরের জ্যোৎস্না-ভরা [বনলতাবিতানে] ঝোপঝাপের ধারে দাঁড়াইয়া চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া থাকিও—অনন্ত পথের যাত্রীদের [ঐ মুক্ত, উদাস পথ] যাত্রা তোমার চোখে পড়িবে। [নীলশূন্য] ঘূর্ণমান অনন্ত বিশ্বরাজির প্রাণী তারা,–গতি-পথ তাদের অনন্ত শূন্য পথে দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, [অবাধ], উন্মুক্ত, বন্ধহীন, উদ্দাম তাদের পথযাত্রা—জ্যোৎস্না মাখানো উপর আকাশের বায়ুস্তর তাহাদের গমন পথে পথে [দিব্যদেহ সুরভিতে] দেহগন্ধে সুরভি হয়,—[পৃথিবীর কোনো হতভাগ্য আর্তের] হয়তো শ্মশানে শিশুপুত্র দাহ করিয়া মা একা ঘরে ফিরিতেছে, জনহীন সঙ্গীহীন [অভাগা] কেহ মৃত্যুশয্যায় একা শুইয়া, দেখিবার কেহ নাই, দীর্ঘ অপমানে *** নিস্পাপ আত্মা হয়তো শুদ্ধ পদ্মমধুর সৃষ্টি করে উহার আসা তাহার অবাধগতি ও দুঃখে [তাদের মধ্যে কোনো] কোনো দয়ালু আত্মা হয়ত পদ্মমধুর সৃষ্টি করে—ধুলাবালিতে, পর্বতে প্রান্তরে পড়িলে কালে তাহা হইতেই মণিরত্ন জন্মায়।

ফাগুনরাত্রে চাহিয়া দেখিও—দেখিতে পাইবে।

ও বাব্‌... বা— মা—মা

ও বাব্‌ – বা – আ – মা – মা –

ছেলে ঘুম পাইয়া ফুঁপাইয়া মাটিকাদায় কাঁদিতেছে।

Spiritual face of a man – রাজু?

Some book on Sangha *** বুদ্ধ?—

Description of some coarse-with officials of ***

মৃত্যু রাত্রের অন্ধকারে ডুবে গেল...

রাজু রায়—উঠান ভেঙ্গে আসচে এক পা ধুলো-এর ওর বাড়ি খেতে যায় তাড়িয়ে দ্যায়—ভুবন মুখুয্যের কাছে ঋণী—সেইজন্যেই সব জায়গায় বেড়ায়। ওর বাটী জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে আছে—দুর্গাকে মিছরী খেতে দ্যায়—ছাঁদা তৈরি করে দ্যায়, আজীবন গ্রাম [গ্রামে?] পূজা। করে—পুঁটুলি রাখে ভালো রাঁধবে বলে—জ্বর হয়, দুর্গা সারায়, দুর্গা মরে, জ্বরে ভুগে ভুগে, বলে—অপু রেলগাড়ি দেখাবি একদিন? সন্ধ্যার সময় কিছু আদর না—অনেক রাত্রে মরে যায়। সকালে উঠে সৎকারের গোলোযোগ—রাজু রায় বলে আস্তা পরিয়ে দ্যাও।—অপু কাঁদে,—অপু কাঁদলে তাকে মনে রাখে।... শেষকালে রোগে ভুগে ২ দুর্গাকে কেউ দেখতে পারে না, সবই সবই আরো বাড়ে—

রাজু রায়ের impression ছেঁচে তৈরি

—সেকেলে ভিটে, তার নিজের মার কথা—পুরোনো

পুরোনো কোন—ঐ ভিটেতে

ছটফট করে—

দুর্গা—চা—মা ভালো করে চা দিকে—

দুর্গা আর চাহিল না। মহাডমরু রোল

তাহার মাথার শিয়রে মহারুদ্রদেবের মহাডমরু বাজিয়া উঠিয়াছিল। অনন্ত শূন্যে সারা আকাশ ধরিয়া (বাহিয়া?) তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই শুভ্রদেহের উদাত্ত শান্ত...ভাব।

নীরেন্দ্র যখন শুনিল তখন যেন সারা আকাশ জুড়িয়া গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠে বেহাগ রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে, উদাত্ত, উদাস, নিস্পৃহ। আত্মার করুণ বটে, কিন্তু কোনো কাঁদুনি সুর নয়, জীবন-দেশে—দূর পথের কোন অন্ধকার বেলা একটু একনজরে পড়ে...উদাস, নিস্পৃহ, শান্ত, নির্বিকার...অনেকদূরের দেশ, সেই নদীতীর, সেই ধলচিতের গান, সেই সোনাডাঙ্গার মাঠ, সেই অপু—এখন সে কোথায়? সব স্বপ্ন হয়ে গেছে—কোন দূর অতীতে মিশে গেছে...শূন্যে কত কত অদৃশ্য দেশ...এরকম কত অশ্রুভরা নদীতীর, কত আনন্দবীর্য, কত বেদনাভরা কুসুমবিতান... করুণ জ্যোৎস্নারাত্রি...স্তব্ধ আকাশ জ্যোৎস্না মাখা—

গম্ভীর জীবনের আনন্দ কাউকে বলা যায় না—বেদনা মাখা উদাস জীবনানন্দ...এ শুধু অন্তরের অন্তরে অনুভব করা যায়..এক মুহূর্তে জীবন ধন্য হয়...ষাট বৎসর বেঁচেও যদি একদিন কয়েকমুহূর্তের জন্য এ জীবন রসের উপভোগ করা যায়, তবে ষাট বৎসরের ব্যর্থ জীবন সার্থক...ঐ কয়েক আনন্দ-ভরা-মুহূর্তে তার ষাট বৎসরের ব্যর্থতা সফল হোল... নির্জনরাতে, নিজের মনের মধ্যে শান্ত ভাবে, এ শান্তি, জীবনের এরকম ধারা খুঁজে পাওয়া যায়...অন্য কোথাও নয় বাইরের গোলমালে হয় না...গভীর, সমাহিত চিন্তা, ও উদাস কল্পনা দ্বারাই শুধু এ অমৃতলোকের অদৃশ্য তোরণ-দ্বারের সন্ধান মেলে। মনোজগৎ যাহাদের নিকট অনাবিষ্কৃত,মেরুপ্রদেশের তুষারবৃত নির্জনতার চেয়েও অজানা, অপরিচিত...তারা তা বুঝতে পারবে ...উদার-প্রসারী মাঠের মধ্যে, অনন্ত তারা-ভরা নীল আকাশকে সঙ্গী করে, নদীর মর্মরে, পাখির কল-কাকলী রবে, ফুলে-ভরা ঘেঁটুবনের ধারে বসে একমনে খুঁজো..মন যদি তোমার তৈরি হয়ে থাকে—সন্ধান মিলবে।..

23-2-25 Bha.

ছয়

Bha 23-7-26

একবার ৪ বছরে হারাইয়া যায়...অপু ছেলেবেলায় বড় ছুটাছুটি করিত—একবার হারাইয়া যায়—তাহার প্রথম সন্দেশ—সন্দেশকে সে নিমন্ত্রণ বলিত—একবার নাকি সে ২০ বছর বয়সে রেলগাড়ি চড়িয়াছিল—সে মনে করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই মনে নাই...হায়! তাহার জ্ঞান না হইলে কে আসিয়াছিল—অপুর শ্লোক আবৃত্তি যেখানে সেখানে বিবাহসভায় শিষ্যবাড়ি—অপুর লজ্জা করে— যাত্রার দলে—

২০ বছর বয়সে ওকে ছেড়ে থাকতুম না—অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে—অনেকদিন পরে ওসব তখন বাল্যের বিস্মৃত লক্ষণীয় তারুণ্য।

রাঙা আতপ চাউলের ভাত...খাওয়া সম্বন্ধে আবদার... পরের খাওয়া দেখতে ভালো লাগে...একবার তাদের বাড়িতে কে একজন এসেছিল সে খুব খেয়েছিল...

গ্রামের সবকিছুতেই wonder : সে একটা পথ... অনেকদিন থেকেই সেটা তার মনে অদ্ভুত রহস্য ও বিস্ময় এনে দিত পথটার দুধারে সঁড়ি বনগাছ ঝুপড়ি হয়ে পড়েচে...পাখি ডাকে...বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ফোটে...ছায়া ছায়া দেখা যায়..কোথায় গিয়েচে ও পথটা—কতদূরে? সে কি দেখিবে না?...অ-নে-ক দূর—অ-নে-ক দূর...

কি অনন্ত রহস্য ওর ওপারে...কোন সূর্যাস্ত পারের দেশে ও চলে গিয়েচে?

অপুর এই ছেলেবেলার wonder নিয়ে ও শৈশবজীবনের সেই দৃশ্য নিয়ে গোটা তিনেক অধ্যায় লিখতে হবে..শৈশব জগৎ সবই আবছায়া-আবছায়া— দিনের চর্যা,..সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না.. মায়ের কোন্ রূপকথার জগৎ.বেঙ্গমা-বেঙ্গমীদের দেশ কোথায় রাজকন্যা শুয়ে আছে...ওইসব earlier chapters... তখন তাহার বয়স ছয়।

With the world of the creation...ডিকেন্স, টলস্টয়, ...টুগেনিভ, কালিদাস... সাহিত্যজগতের সৃষ্টিকর্তা ও রথীরা তাদের জগতে fascinating tour হঠাৎ ওর পদধ্বনিও ক্ষীণ স্রষ্টা...তাদের উজ্জ্বল মুখ..তাঁদের বিষয়ে বলে

হঠাৎ কল্পনা ভয়ানক ভেঙে ওঠে এবং তোমাকে এমন সৌন্দর্য্য ও নির্যাসের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে যার অস্তিত্ব তুমি কোনোদিন ধারণাও কর নাই।

দুর্গার অপমানের সঞ্চয়গুলো ওর *** ছুটে গিয়ে...

দুর্গা মারা গিয়েছে...তখন সর্বর পুতুলের আর দুটিন আছে...আজ কতদিন সে পুতুল লইয়া খেলিতে বসিতেছে...আর অন্য কাহাকে তার বাক্সের অমন পুতুল সে প্রাণ ধরিয়া দ্যায় নাই... *** খেলিবে...ওরে ফিরিয়া আয়...সমস্ত পুতুল ওখানে লইয়া যা।

হরিহর অর্থান্বেষে বিদেশবাসী—৺পূজার সময় আসিয়াছে..খবর নাই...খরচপত্র নাই...খাওয়া হয় না... ধার..থালা বাঁধা...ঘটি বাঁধা... dire poverty...চুরি... খাওয়ার কষ্ট...ভাত জুটে না...চিঠিপত্র থাকে টাকা দোব.. পিওনের মুখ চাহিয়া থাকে..নীরেন নাই..

ঘোর বর্ষা পড়িয়াছে.. কাঠ নাই... দুর্গা ওলের ডগা তুলিয়া আনে, পাটশাক... কাঁটালের বীচি... তাও জুটে না... দুর্গা বার বার জ্বরে পড়ে... কোথাও গিয়া নিমন্ত্রণ খাইল.. কেউ দ্যাখে না... ওষুধপত্র নাই... পথ্যের খরচ নাই...

সারারাত ফুটা ছাদে জল পড়ে... দুর্গাকে ওঠায় ওই দিদি জল পড়ছে...অসুস্থ শয্যাগত দুর্গা ওঠে... সেখানেও জল পড়ে.. দুর্গা কাঠকুঠা কাটিয়া আনে.. সর্ব্ব কলার কাঁদি চুরি করে হাসে-মায়ে-ঝিয়ে-ছেলেতে আমোদ করে হাসে... বাইরে ঘোর বর্ষা... অপু বলে মা কলার বড়া খাবো... কাপড় নেই... পূজার ঢাক বাজে.. ওদের কেউ দেখে না... বধূ এখানে নাই...

একদিন রাত্রে খুব বর্ষার পর আকাশ পরিষ্কার... বাঁশবন হইতে তখনো টুপটাপ বর্ষার জল পড়িতেছে... আলোয় তেল নাই... আলো জ্বলে না... একপয়সার একটু কেরোসিন তেল রাতবিরাত রেখে দেয়— দুর্গার হঠাৎ সন্ধে থেকে জ্বর বাড়ে... ভুল বকে—রেলগাড়ি চড়বো... রেলগাড়ি চড়বো...

শেষরাত্রে দুর্গা কেমন করে—ভালো করিয়া চাহিতে পারে না—দুর্গা মা—চা-মা—চা দিকি—

দুর্গা আর চাহিল না...

পূজার কিছু আগে হরিহর বাড়ি আসিল—সে মেয়েকে ভালো *** কাপড় আনিয়াছে—মা-ওমা দুগ্‌গা।..

(অদ্য বড়বাসায় মাপজোক করিয়া estimate লওয়া হইল)।

Bha 28-7-26

ভয়ানক বর্ষা। ৭/৮ দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি—দিনরাত অবিশ্রান্ত ধারা—পুবে হাওয়া—নদীর জল হুহু বাড়িয়া বাঁশতলায় আসিল—অপু বলে—দিদি—বাঁশতলায় জল এসেচে-হরিহর বাড়ি নাই—ঘর পড়ে পড়ে—সারা ঘরে জল—রাত্রে সর্ব্বর প্রাণ উড়িয়া যায়—একা অসুখ শরীরে দুর্গা সাবু কিনিতে পয়সা নাই—চাল নাই—ভয়ানক বর্ষা— ও ঝড় কত ঘর দোর পড়িয়া গেল—চালের বাজার চড়া— বধু সাহায্য করে—অন্ধকার বাঁশবনে সারারাত বৃষ্টি পড়ে—নদীনালা জলে ভরিয়াছে—কাঠ নাই—চাল নাই—কাপড় শুকায় না—উনুনে জল—ভাঙা রান্নার চাল।

সাত

এমন সুবিধা হয় নাই, যাহাতে সে গাড়ি চড়িতে পারে। তাহার মা-ই জীবনে মোটে একবার রেলগাড়ি চড়িয়াছে, [সেজঠাকরুনের সঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতেছিল ও শেষ রেলগাড়ি] অনেকবার বাবাকে বলিয়াছে—বাবা, আমি একদিন রেলগাড়ি দেখবো? তাহার বাবা বলিত—এই এবার খাজনাপত্র কিছু ভালো রকম আদায় হলে চল একদিন সবসুদ্ধ গিয়ে চাকদায় গঙ্গায় নেয়ে আসবো কিন্তু এতবার বলিয়া কোনোবার কিছু হয় নাই। [রেলগাড়ি চড়িবার কথা বলিতে তাহার কাছে] অপুর একখানা ইংরিজি কি বই আছে [তাহাদের দূর-সম্পর্কের জেঠামশায় দিয়া গিয়াছিলেন] তাহাতে রেলগাড়ির ছবি সে দেখিয়াচে বটে। খুব লম্বা, অনেকগুলা চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে—ধোঁয়া উড়ে যাইবার সময় এমন অধিক শব্দ হয় যে যারা চড়িয়া থাকে তাহাদের কানে তালা ধরিয়া যায়। একবার রেলগাড়ির আওয়াজ শুনিবার জন্য সে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তার ধারে গিয়াছিল... বিকালবেলা একখানা গাড়ি নাকি যায়... অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়াও সে কোনো শব্দই শুনিতে পায় নাই। তবে অনেক দূরে মেঘের মতো একটা যেন কি শব্দ হইয়াছিল—বাড়ি আসিয়া সে বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিয়াছিল উহাই নাকি রেলগাড়ির শব্দ। বেতনা নদীর সাঁকোর উপর গাড়ি উঠিলে নাকি ঐরকম আওয়াজ হয়। কিন্তু সে জানে উহা রেলগাড়ির আওয়াজ নয়, তাহার বাবা তাহাকে ভুলাইবার জন্যই ঐ কথা বলিয়াছে। আর একবার তো অপুর সঙ্গে রেলরাস্তা দেখিতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলে—কিন্তু এবার আর কোনো [সন্দেহ] কথা নাই, এবার সে নিশ্চয় রেলগাড়ি চড়িবে—একটু-আধটু নয়—একেবারে দুদিন। রেলগাড়িখানা নাকি আগাগোড়া লোহার, চাকাও লোহার। গরুরগাড়ির মতো কাঠের চাকা নয়। রেলগাড়ি যেখান দিয়া যায়, তাহার নিকটে কোনো খড়ের ঘর নাই। থাকিতে পারে না। পুড়িয়া যায়—রেলগাড়ি যখন যায় তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হইতে থাকে...[সে ছবিতে দেখিয়াছে]।

[দুই দিন ধরিয়া রেলগাড়ি চড়িবার কল্পনায় দুর্গার সারা গা আবার যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহা ছাড়া তাহার] নীরেন খুব বড়লোক—তাহার সঙ্গে বিয়ে হইলে সে কত কি খাইতে পাইবে...লুচি, বড় বড় মাছ, ঘি দেওয়া ডাল, [চানাচুরভাজা, পাঁপরভাজা] বড় বড় আলুর ডান্না, কত কি—উহারা বড়লোক, উহারা সব তরিতরকারিতে ঘি দিয়া খায়..বর্ষার সময় খিচুড়িতে সে [ইচ্ছামতো] ঘি দিয়া খাইবে। একবার খুড়িমা আরবছর শ্রাবণ মাসে কলাইডালের খিচুড়ি রাঁধিয়াছিল, সে কি কাজে ওদের বাড়ি যাওয়াতে তাহাকে ডাকিয়া রান্নাঘরের মধ্যে বসাইয়া বড় থালার একথালা খিচুড়ি খাইতে দিয়াছিল আর প্রায় এক থাবা গাওয়া ঘি দিয়াছিল তাহার পাতে। [দিয়াছিল] ঘি দিয়া খিচুড়ি [কি সুন্দর যে-লাগে! ভারী ভালো লাগে।] কি চমৎকার যে লাগে! বাড়িতে [তাহার মা কোনো কোনোদিন খিচুড়ি রাঁধে বটে কিন্তু] ঘি দিয়া খিচুড়ি সে কখনো খাইতে পায় না। [চানাচুর] পাঁপরভাজা তো সে মনের সাধ মিটাইয়া খাইবে—সেবার পাঁপরভাজা নবাবগঞ্জের বাজার হইতে একজন লোক বিক্রি করিতে আসিয়াছিল—[অপু

খাইতে চাহিল কিন্তু] কালীতলার সামনে কড়া] সে চেঙ্গারী নামাইয়া পাঁপর বেচিতেছিল—অনেকে কিনিতেছিল—সঙ্গে ছিল সে-অপু বলিল—এক পয়সার পাঁপর কেননা দিদি, তুই আর আমি খাবো?

আট

যাই হোক যাত্রার দলের সাজ এল অপু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে—দ্যাখে। মনের মধ্যে শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছোটে...বাড়ি আসে—তার বাবাকি কী হিসেব লিখচে—মনে মনে খুব খুশি হয়ে গুনগুন গান কচ্ছে—অপু ভাবলে তার বাবা যাত্রার দলের আসবার কথা শুনে স্ফুর্তি পেয়েছে—অপু উৎসাহের সঙ্গে বলে—বাবা, সাজ একেবারে দশ বাক্স এরকম দল—! বাবা বিস্ময়ে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য্য হয়। এত বড় একটা ঘটনা বাবার জানা নেই। বা তা থেকে বাবা কোনো আমোদ পায় না? বাবাকে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে—সকালে যাত্রা দ্যাখে—জীবনকেতু বন্দী হোল, তার কারাবাস হল—অপু ফুলে ফুলে কাঁদে—পাশে কে একজন বলে দূর! গান নেই, টান নেই, এই সং দেখিয়ে পয়সা নেবে না কি?—এক নেশার ঘোরে না খেয়ে, না দেয়ে সমস্তদিন কাটিয়ে অপু বাড়ি আসে—ঘুমোয়—ঘুম থেকে উঠে তার বুক টনটন করে—জীবনকেতু যে সাজিয়াছিল তাহার সহিত love জমিয়াছে—সে উহাদের বাটিই খাইল—অপু পাগল—শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—যদি মরিতে বলে তবে মরে—২/৩ দিন খাইয়া চলিয়া গেল—একদিন বলিল যাত্রার দলে যাবে খোকা? অপু রাজী হয়—ওই তাহার ambition এর চূড়ান্ত—সে জীবনকেতু সাজিয়া তলোয়ার ধরিয়া যুদ্ধ করিবে—পলাইয়া যাইতে রাজী হয়—তাহা কার্যে পরিণত হয় না—কয়দিন সে মনোভঙ্গ অবস্থায় বেড়ায়—পরে ঘেঁটুফুল টুপিতে গুজিয়া তলোয়ার লইয়া মহাভারতের মতো আপনমনে জীবনকেতুর part করে—মা দেখে দেখে হেসে বলে পাগল হল—৪/৫ দিন সে উত্তেজিত ও মুগ্ধ, অভিভূত অবস্থায় কাটায়—তার চোখের সামনে সবসময় জীবনকেতু—তার কানে সবসময় তার বাঁশী, মরণের, মরণ সময়কার বক্তৃতাধ্বনি—যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তলোয়ার জীবনকেতু নিজের বুকে প্রবেশ করাইয়া দিল—সেই দৃশ্য। অপু নিজে যাত্রার দলে যাইবে। সে আর কিছু চাহে না! সে বসিয়া ২ acting শিখিতে লাগিল—দল বাঁধিবে—বসিয়া বসিয়াই যত রাজ্যের পালক তলোয়ার, ছাতির শিক বাঁকাইয়া ধনুক, ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে লাগিল—মা বকে—বাবা বকে—

১০/১৫ দিন পরে excitement ক্রমে ২ নিবিয়া আসিল। Law of Satisfaction.

Luxury জিনিসটা অপব্যয় মাত্র। অপু ওই যাত্রা দেখিতে যে আনন্দ পাইয়াছিল, লোকে বিলাত গিয়া সেইরকম আনন্দ পায়—যে কখনো কিছু দেখে নাই, তাহার একটি বিলাতী ভেঁপু বাজনা পাইয়া যে আনন্দ হইবে, উচ্চ ধরনের প্রচুর বিলাসী বাবুর পিয়ানো কিনিয়া হয়তো সেই আনন্দ হইবে। আনন্দ উপকরণের উপর নির্ভর করে না। তাহার মা প্রথম যে দিনটি আড়ংঘাটায় ঠাকুরবাড়ি গিয়াছিল, সে যে আনন্দ পাইয়াছিল—বড় মানুষের বন্ধু হীরা জহরতের পরিয়া বম্বে যাইয়া সেই একই আনন্দ পায়।

আনন্দের nature একই রকম। ধনী নির্ধন ভেদে তারতম্য হয় না। বরং যারা বিলাসী, জীবন যাহাদের spoil করিয়াছে, সুখানুভূতির শক্তি তাহাদের ক্রমশ ভোঁতা হইয়া আসে। Freshness of outlook বজায় থাকে জীবনে বঞ্চিত হইয়া থাকিলে।

তাহার দিদি দুর্গা সিগারেটের ছবি পাইয়া যে খুশি হইয়াছিল, বড় মানুষের মেয়ে তরুলতা মোটর কিনিয়া সেই আনন্দ পায়—আনন্দ সমান। একটা সিগারেটের ছবি আশ্রয় করিয়া আসিল—কারণ তাহার জীবনের outlook fresh আর একজনের মোটর আশ্রয় করিয়া আসিল, কারণ বিলাসে তাহার outlook ও সুখানুভূতি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।

বড় হইলে অপু বিলাত গিয়াছিল—সে মনে ২ বুঝিয়াছিল—দেখিয়াছিল, বিলাত যাইবার পূর্ব মুহূর্তের। উৎসাহ, আনন্দ ও অজানার মোহ সেই একই রকমের যাহার সঙ্গে সে শৈশবে পরিচিত ছিল—সেই প্রথম যাত্রা দেখার দিনের উৎসাহ ও আনন্দ—

তরুলতা contrast—সিগারেটের ছবির incident must be made a book to bring this psychological observation upon.

(30.3.26 ইসমাইলপুর। দুপুর। খুব পশ্চিমে বাতাস বইছে। ধুলায় চারিদিক অন্ধকার। এই মাত্র পরমেশ্বর সঙ্গে আসিল। কাল সকালে ভাগলপুর যাইব। আজ টোটা বন্দুক লইয়া বাঁইচী খামারে শিকারে যাইবার কথা ছিল, গেলাম না)

(ঘুমাইয়া ওঠা ও মাত্র তখনই Apu I)।

শুইয়া শুইয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। দুপুরবেলা।

ঘুম থেকে উঠে সে দেখলে বেলা একেবারে পড়ে গিয়েছে—সমস্ত শরীরে আলস্য...বাইরে সে উঠে দেখতো সমস্ত বাড়ির উঠানটা ও মাটির পথ ছায়া পড়ে গেছে বনফুলের গন্ধ বেরুচ্চে-বাঁশবনে কোকিল অবসন্ন স্বরে ডাকচে—অপু জড় মন নিয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর বসে থাকতো—এ সময় তার মনে একটা অপূর্ব্ব ভাব আসতো বড় বিষন্ন ভাব আসতো...সে মার জন্যে এদিক ওদিক চাইতো মা নেই...দিদির জন্যে মন বড় কেমন করত—এসময় তার মনের ভাবটাই হচ্ছে মন বড় কেমন করা...আশ্চর্য্য এই যে এখন তার মনে সকলের জন্যে কেমন একটা দুঃখ হোতো...যে বুড়িটা ঘাটে সেদিন মরে গেল, তার জন্যে... রাজু পালিতের স্ত্রীর জন্যে...কুকুরটার জন্যে মনে হোত সকলেই বড় বেচারি...বেশিক্ষণ এ অপূর্ব, মধুর ভাব তার মনে থাকতো না।

বড় হোলে যখনই গ্রীষ্মদিনের দুপুরবেলা হয়তো সে ঘুমিয়ে উঠেছে...একটু বেশি পরিশ্রমের পর তখনই—ঘুম ভেঙে ছেলেবেলাকার এই বেলা পড়ে যাওয়ার কথা মনে হোত—

তার শৈশব আবার ফিরে আসতো, সেই তাদের ভাঙ্গা বাড়ি, সেই ছায়া, পাখির ডাক সেই ছেলেবেলাকার মা, সেই দিদি, তাহার রুক্ষ চুল নিয়ে, সেই বাবা, সেই মাটির পথের ছায়াভরা অপরাহ্ন, কোকিল ডাকা, দিদির সেই ডাগর ডাগর করুণ চোখ...

V. I. Apu II

অপু কেবল মাকে বোলতো মা আমি তালের বড়া খাবো?.সর্ব্ব করে করে দিতো...অপু প্রবাসে..সর্বজয়া। তালের বড়া অপর লোকের বাড়ির নিমন্ত্রণে খাইতে গিয়া কান্নার বেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল...পাছে ধরা পড়ে এজন্য অতি কষ্টে সামলাইল... কতদিন সে ছেলের মুখ দেখে নাই..তালের বড়া সে কি করিয়া খায়?.. মনে করিল সেই বড়লোকের বাড়ির নীচের ঘরে চুপিচুপি সে ছেলেকে চুরি করিয়া উহা খাওয়াইবে।

অপু একটু বোকা বোকামি করে ঢাকতে যায়...***বাক্সে ফেলে দিয়ে এলাম তো...আমি ঠিক দিইচি মা তোমার গা ছুঁয়ে বলচি...

নয়

[ফুটে উঠতো, [নিউদ্দিশ হয়ে গেল]—সেই বৌ নিউদ্দিশ হয়ে যাবার পর—সকলেই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল নিউদ্দিশ হোল? ...কি হয়েছিল? —ভালো ঘরের মেয়ে ছিল—বাপের তেমন পয়সা ছিল না—এখানেই বিয়ের পর বরাবরই থাকতো। শাশুড়ি বড্ড খারাপ লোক ছিল, খুঁটিনাটি ধরে গঞ্জনা, ঝগড়া—যা খুশি হোত, মুখে যা আসতো।

গালাগাল দিতো [বৌটাও] মুখ বুজে থাকতো, বড্ড শান্ত বৌ-একবার বৌ-এর ভাই এল সে চলে গেলে কিছুদিন পরে বৌ-এর একখানা কি গয়না খুঁজে পাওয়া গেল না.. শাশুড়ি বল্লে লুকিয়ে ভাইকে দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েচে...

সাতপুরুষ তুলে গালাগাল দিতে লাগলো—তারপর মায়ে-বেটায় ধরে একদিন বৌটাকে দিলে খুব মার...মার খেয়ে তার পরদিন সকাল থেকে আর বৌটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না...বাপের বাড়িও খোঁজ নিলে—সেখানে যায়নি কেউ বল্লে জলে ডুবে মরেচে-কেউ বল্লে বেরিয়ে গিয়েছে...কিন্তু কোনো খবর হল না যে কোথায় গেল... তেমনি ফলও ফললো...গোলক রায়ের ছেলে, [তার সোয়ামী] এই দশাসই জোয়ান, নাম ছিল নিবারণ— খেয়েদেয়ে শুয়ে আছে, বল্লে মা আমায় কিসে কামড়েচে... আলো জ্বালতে, রোজা ডাকতে তস সল না...ঢুলে পড়লো...পইতে তারা উঠতে না উঠতে নিয়ে বের কল্লে— এই তো সেদিনের কথা।

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—নিবারণের কি হোল ঠাক্‌মা?

দুর্গা বলিল—তুই এমন বোকা অপু?...বুঝতে পাল্লিনে?

—নিবারণ মরে গেলে দিনকতক বড় উপদ্রব হয়েছিল বাপু...রোজ যেন বাড়ির পেছনে ঠিক ছোট ছেলের কান্নার মতে শোনা যেত—আমরাও কতদিন শুনিচি—ঠিক যেন একটা ছোট ছেলে কানচে—

[অপু বলিয়া উঠিল] শান্তিস্বস্তেন—কত কাণ্ডকারখানা করা হল, শেষকালে ছোটো ঠাকুর গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসেন তবে বন্ধ হয়—তা তখন তো এমন জঙ্গল ছিল না—এই তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ চড়কতলার মাঠের ধারে কাপালিপাড়া ছিল একশো দেড়শো ঘর—আদ্ধেক রাত অবধি শোনো কথাবাত্তা, হৈ-হৈ, কলকল শব্দ, ঢোল বাজচে, গান হচ্চে [কোথায় সব গেল?]..যেন আড়নের মেলা বসেচে—আহা, কোথায় সব গেল!

[গল্প অপুর যেমন] দুর্গা ও অপু আগ্রহে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পালিত-পিসির কথা যেন গিলিতেছিল—দুর্গা বলিল—কাপালিরা কোথায় গেল?

—মরে হেজে গেল—এখান থেকে উঠে গেল—এই সব বন নাকি আর এমনি কথা হল একদিনে! মানুষ না থাকলেই বন হয়...আমি আর বসবো না বৌমা-রাত্তির হল কত—]।

আরো খানিক কথাবার্তার পর দরদস্তুর চুকাইয়া পালিতপিসি...[চারিটাকায়] ফুলকাসার বাটিটা [হাতে লইয়া] বারো আনা পয়সায় [ক্রয় করিয়া] পাইয়া বাড়ি চলিল— সর্ব্বজয়া [এসব ক্রয়বিক্রয়] জিনিসের দরদস্তুর ব্যাপারটায় যে অত্যন্ত কাঁচা, [পালিতপিসি] পালিত বুড়ির তাহা জানিতে বাকি ছিল না। সে আরো দু-একবার এরূপ দাও মারিয়াছে, সেই ললাভেই এত গরজ করিয়া তাহার রাত্রিবেলা [আসিয়াছে] আসা। সর্ব্বজয়া [হাজার হইলেও এখনো ছেলেমানুষ, বয়স ২৭/২৮-এর বেশি নয়]—সংসার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ—তাহাকে ঠকানো বেশি কথা নহে।

দরজার কাছে আসিয়া সর্ব্বজয়া বলিল—আর দুটো আনা পয়সা দাওগে যাও পিসি—তবুও আমার আধপোয়া তেল হবে এখন—তুমিই বলো—এসব জিনিস কি আর হাতছাড়া করবার সাধ? কি করি বলো সংসারের বড্ড কষ্ট হয়েছে—সেই এক মানুষ কদ্দিন হল বেরিয়েচেনা একখানা পত্তর—না একটা টাকা—[একা বৌ মানুষ] কি করে সংসার চালাই বললা দিকি?..একা বৌ মানুষ কোথায় যাবো?...ঘরে না চাল, না কাঠ—এই পুজো আসচে লোকে কত ভালোমন্দ কিনচে কাটচে...সেদিন সতুর ছোটোভাই-এর গায়ে জামা রাঙা কেমন চকচকে—এই যেন অনেকটা বেনারসী চেলীর রং—কিসের জামা বল্লে যে— তার কাকা এনে দিয়েছে কলকাতা থেকে। বলি এইরকম একটু জামা আমার অপর গায়ে হোত—দেখে বড় লোভ হল...অমন গায়ের রং, ছেড়া কাপড় পরে পরে বেড়ায়—কি বলবো পিসি, বুক ফেটে যায়—ছেলেটা জন্মে পর্য্যন্ত একখানা ভালো কাপড় কি একখানা ভালো জামা যদি কোনোদিন দিতে পেরিচি—কিন্তু জামা তো অনেক জলের কথা গেল—এখন কি খাইয়ে যে বাঁচিয়ে রাখি—সেই হয়েছে কথা—

চাল...পড়ে আছে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যদি দুটো দিন চলে-মেয়েটা কোত্থেকে দুটো কাকরোল এনেচে-ভাজা খেতে ভালোবাসে—এমন একটু তেল ঘরে নেই যে ক'খানা ভেজে ওদের পাতে দি—

পরে সে খপ করিয়া পালিতপিসির হাত ধরিয়া বলিল— দুটো আনা পয়সা দাওগে পিসি—তবুও—অনেক উপগার হবে আমার—

[—আচ্ছা আচ্ছা বৌমা—সে আমার কাছে অনেয্য হবে

—আচ্ছা তা বলচো দু আনা দেবো—আজ তো আনিনি—কাল দিয়ে যাবো এখন—

—কিন্তু একথা যেন পেরকাশ না হয় পিসি—সবই তো জানো—যে গাঁ—

—সে বলতে হবে না তোমার—নৈলে কি আর রাত করে আসি? কাকপক্ষীতে জানতে পারবে না—সে ভয় নেই বৌমা—সেই সেবার ডিবে জোড়াটা যে দিলে—কেউ কি জেনেচে—সেরকম লোক পাওনি বৌ! আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাবো—রাত্তিরে কে আর দেখতে যাচ্চে?...]

দশ

(ক)

অপুও বই পাইলে আর কিছু চায় না তবে মায়ের প্রস্তাবের সঙ্গেও তাহার সহানুভূতি আছে। দীনু জেঠামশায়ের মতো সে-ও বেশ ঐরকম নামাবলী গায়ে, হাতে শালগ্রাম, পায়ে চটি বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপূজা করিয়া বেড়াইবে, পুটুলি বদলে লাঠি হাতে একা একা দূর বিদেশে শিষ্যবাড়ি বেড়াইতে যাইবে, ইহাও তাহার কাছে কম লোভনীয় মনে হয় না।

একদিন তাহার বাবা একখানা পুরনো বই হাতে করিয়া আনিয়া তাহাকে ডাক দিল—তোর জন্য বই এনেচি দেখে যা ও খোকা—কয়েকখানা পাতা ছেঁড়া, নাম 'নেপোলীয়ন বোনাপার্ট'।

গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পরিত্যক্ত কাঠের বাক্সের ভিতর অন্যান্য অনেক ছেঁড়াখুঁড়া বই-এর সঙ্গে এটাও ছিল, হরিহর ছেলের জন্য চাহিয়া আনিয়াছে। কয়েক পাতা পড়িয়াই বইখানার অভিনবত্ব অপু খুব বুঝিতে পারিল। যুদ্ধের কাহিনী [বইখানা ভর্তি] পাতায় পাতায়, তাহা ছাড়া ভাষা এত সুন্দর যে কত স্থানে সে একটা অপরিচিত ভূমিশ্রীর ছবি চোখের উপর দেখিতে পায়। বইখানা সে আর ছাড়িতে পারে না। খানিকটা করিয়া পড়িয়া বাবার কাছে সেটার গল্প করে। বাবাকে বলে—তোমার ঐ গানের সুরটা বলে দাও না বাবা? ঐ যে 'নিয়েছ ফল ধর বলে' তুমি গাও? সে গান করিতে ও শুনিতে ভারি ভালো বাসে। আগে আগে সে ও তাহার দিদিতে মিলিয়া কত গান গাহিত। আজকাল নদীর ধারে সে ও পটু [বেসিয়া] দুজনে বসিয়া গান গায়, অনেক গল্প করে। সে পটুকে বই-এর গল্প সব শোনায়। পটু মুগ্ধ ভক্তের মতো অপু-দার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—সে-ও অপুদার মতো ঐরকম বই পড়িতে শিখিবে, এরকম গান শিখিবে। অপু-দার গলার সুর কি মিষ্টি!

(খ)

[অপু তাহাদের বাড়ি হইতে আসিতে আসিতে শুনিতে পায় সুরেশের কোন্ প্রশ্নের উত্তরে লখাই উৎসাহ সহকারে বলিতেছে—অপু-দা? উঃ খুব! ওরকম ছেলে এ গাঁয়ে নেই সুরেশদা—

একদিন বৈকালের দিকে সুরেশদের পথের ধারে কুলতলায় সুরেশ ও তাহার ছোট ভাই-বোনে কুল পাড়িতেছে—অপু সেখানে গেল। সুরেশ হাসিমুখে বলিল— এসো ভাই, কুল খাবে? একটু পরে বলিল—আমার

একখানা ছুরি হারিয়ে গিয়েচে এইখানে কোথায় বনের মধ্যে? একটুখানি খুঁজে দ্যাখো না ভাই? খুঁজিতে খুঁজিতে অপু ছুরিখানা পাইল। তাহার পর আরো অনেকক্ষণ খেলা ও বেড়ানো হইল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমের ডালে দোয়েল ডাকিতেছে— মাঘ মাসের শেষ। সুরেশ হঠাৎ হাসিয়া অপুর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—ভাই, একটা কথা রাখবে? তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাবো—তুমি আমার বন্ধু হবে?

সুরেশের সুন্দর মুখের হাসি অপুর শিরায় শিরায় মাদকতা আনিয়া দিল। সে-ও এতদিন মনে মনে ইহার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা চাহিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই।

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—খু-উব—তুমি আমার বন্ধু হলে আজ থেকে—বন্ধু বলে কিন্তু ডাকবো? বলিয়া সে হাসিল।

সুরেশ হারানো ছুরিখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল— এইখানা খুঁজে দিয়ে তুমি আমার বন্ধু হলে—এইখানা দিয়ে বন্ধু পাতালাম—এখানা নাও। অপু হাত পাতিয়া লইল—একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—তোমাকে তো আমিও দেব—কাল আমাদের বাড়ি এসো ভাই—

কিন্তু মনে মনে সে খুঁজিয়াই পাইল না নতুন বন্ধুর সঙ্গে কি উপহার বিনিময় করিবে।)

(২)

যুদ্ধ সম্বন্ধে অপুর ধারণা একেবারে বদলাইয়া গেল। মহাভারতের আমলের সে গদা, ধনু, রথ, পট্টিশ, তোমর ইত্যাদি অস্ত্রসজ্জা আজকাল আর তাহার মনে কোনো সামরিক ভাব জাগায় না। নূতন-পড়া 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' তাহার মগজ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সমগ্র ইউরোপ—ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ—তার বীরত্ব, জাঁকজমক, ধূমায়মান কামানশ্রেণী। দহ্যমান ক্রেমলিন প্রাসাদ। অষ্টারলিজের অস্ত্রঝঞ্ঝা, তুষারবর্ষী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘদেহ, তরুণ বীরদল—ডিউক ডি কলেন কোর্ট, সম্রাট আলেকজান্দার, সুন্দরী মেরিয়া লুইসা—ছেঁড়া বইখানার

পোকাকাটা পাতাগুলা হইতে তাহার তরুণ কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। তাহা ছাড়া মাস দুই হইতে বঙ্গবাসী কাগজে সে প্রতিসপ্তাহে পড়িতেছে রুশিয়া ও জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রথম দিকের খবরগুলা সে ততটা বুঝে নাই—কোরিয়ারূপ আম্রফল একদিক হইতে রুশভল্লুক ও অপরদিক জাপান-বামন গ্রাস করিতে চাহিতেছে ইত্যাদি ব্যঙ্গ-চিত্র বা মাঞ্চুরিয়া লইয়া যে রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ চলিতেছে প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ বা সংবাদগুলা সে তেমন বুঝে নাই—সেগুলি বাদ দিয়া সে অধিকতর আমোদজনক ভূতের গল্প বা কঙ্কাবতী পড়িতে ব্যস্ত থাকিত।

কিন্তু যখন সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাগজখানাতে অভিযানরত সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিদলের ছবির ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তখন তার অভিজ্ঞ মন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—যুদ্ধ সত্যসত্যই বাধিয়াছে।

কিন্তু এমন যুদ্ধ! সে-ও তো নিতান্ত আনাড়ি বা অজ্ঞ নয়, কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণে তার সমরকৌশল শিক্ষা। জয়দ্রথের ব্যূহভেদ তাহার অজ্ঞাত নহে। অর্জুনের গাণ্ডীবটঙ্কার তাহার সুপরিচিত। কিন্তু ছেলেবেলার সেই শান্ত দুপুরের দিনগুলার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে— বর্তমান যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের অভিনবত্বে ও উগ্রতায় তাহার চমক লাগিয়া গেল। 'সিমোজ' চূর্ণভরা কামানের গোলা যে দেড়ফুট পুরু ইস্পাতের পাত ধুলার মতো গুঁড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে, দু-তিন ক্রোশ হইতে কামানগুলা যে লক্ষ্যভেদ করিবার ক্ষমতা রাখে—জাপানের টর্পেডোবাহী ডুবোজাহাজ অতবড় রুশ যুদ্ধজাহাজখানাকে মাঝসমুদ্রে ডুবাইয়া দিল—এসব কথা একেবারে নতুন—এত নতুন যে কাগজে ছবি না দেখিলে হয়তো সে বিশ্বাস করিত না। অষ্টারলিজের যুদ্ধও যেন ফিকে ফিকে ঠেকে ইহার কাছে। কাগজখানার প্রত্যাশায় সে শনিবারের দিন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে, যেমন আসে, অমনি খুলিয়া আগ্রহের সঙ্গে

দেখে আর্থার বন্দর দখল হইল কিনা। বাঁশবনের পথে বাঁকা কঞ্চি হাতে সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আপনমনে জাপান সেনাপতির অভিজ্ঞতার আস্বাদ পায়। তাহার মা বলে—শুধু বেড়িয়ে বেড়াস পাড়ায় পাড়ায়—একবার খাজনা-টাজনাগুলো যার কাছে যা পাওনা আছে আদায় কর, কি শিষ্যবাড়িগুলো একবার যা-লক্ষ্মণ মহাজনের ওখানে একবার যা, তারা খবর দিচ্চে—চলার উপায় দ্যাখ?

অপুর আদৌ সময় নাই—যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাডিভোস্টক বন্দরে নৌ-বীর কমিমুর প্রবেশপথ পুনরাবৃত্তি তাহার শেষ না হইতেছে, ততক্ষণ নাওয়া-খাওয়ার কথা ভাবিবার সময় নাই—লক্ষ্মণ মহাজনের পারলৌকিক মঙ্গলের কথা তো বহুদূরের।

সেদিন বৈকালের দিকে সুরেশদের পাড়ার একটা উঁচু ঢিবিতে বিশাল সৈন্যসজ্জা হইয়াছে। উভয়পক্ষের সৈন্যই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। একদিকের সৈন্যাধ্যক্ষ অপু, অপরদিকের সুরেশ। নানা পাড়ার ছেলেরা জুটিয়াছে।

ঢিবিটা অপুদের দখলে। ঢিবির ঢালু গড়ানে দিকটা গুলঞ্চের লতা ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চির খুঁটিতে বাঁধা—সেখান হইতে একটা ঢিবির পিছনের তুঁতগাছের দিকে চলিয়া গিয়াছে—কাঁটাতারের বেড়া ও ফিল্ড টেলিগ্রাফ। সমস্তই অপুর পরিকল্পনা। সে আজ ও-বেলা হইতে দলের ছেলে লইয়া ঘাঁটি সুরক্ষিত করিতে ব্যস্ত ছিল। লখাই অপু-দার আদেশ সমস্ত বেলা খাটিয়া সারা হইয়া গিয়াছে—মাটি খোঁড়া, তার টাঙানো। গুলঞ্চের লতা জোগাড় করা অপুদার নির্দেশ অনুসারে দুপুর পর্যন্ত খাটিয়া সব শেষ করিয়া তুলিয়াচে। সে এসব ব্যাপারের কিছুই জানিত না, অপুদার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস, আজকাল সে অপু-দার পিছনে পিছনে সবসময় ঘোরে—অপুদা কত কথা জানে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে—অপুদা যাহা বলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে লখাই-এর কোনো অবিশ্বাস হয় না। প্রমাণের দরকার হয় না—তাহা ঠিক, ধ্রুব সত্য।

সুরেশের দল দক্ষিণদিক হইতে আক্রমণ শুরু করিল। প্রথম আক্রমণেই কাঁটাতারের বেড়া ঝড়ের মুখে শিমুলতুলার মতো উড়িয়া গেল—অপু প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বা রে, কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে ওরকম করে আসো কি করে তোমরা? তলোয়ার দিয়ে কেটে আসতে হবে যে—

সে সব আন্তর্জাতিক কানুন কেহই মানিল না। দল ঢিবির উপরে প্রায় উঠিয়া পড়িল আর অপুর সৈন্যদল তাহাদের একরকম ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল—রাইফেলের গুলি তথা বকুলবীচি উভয়পক্ষে অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল—অপুর হাতে ধনুক ছিল, চার পাঁচটা হুল-বসানো চোখা চোখা বাণ বিপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া মারিল—একটাও ঠিক জায়গায় পৌঁছিল না। তবুও আক্রমণ প্রতিহত হইল—(বিপক্ষ) গুলিবৃষ্টির মুখে বিপক্ষপক্ষ দাঁড়াইতে না পারিয়া নামিয়া গেল—গোলমালে কাহার একটা ধনুক হাত হইতে পড়িয়া যাওয়াতে অপুর দল সেটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল।

অপুর দল উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—জয় জাপানের জয়!

এগারো

হঠাৎ অপুর মনে হইল অনেকদিন আগে শীতের ***তাহার দিদির সঙ্গে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে দুজনে মিলিয়া সেই রেল রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া যাওয়ার দিনটা। দিদি এসব কিছুই দেখিল না! সে এতক্ষণ কাহাকেও বলে নাই, কিন্তু কাল সারাদিন ধরিয়া পথে আসিতে আসিতে পথের ধারের বনঝোপের ছায়া, নোনাগাছ, পানফলের থোকা দেখিয়া জন্মিয়া অবধি খেলার সাথীরূপে যাহাকে সে চিনিত সেই হাস্যমুখী দিদির কথাই সে ভাবিয়াছে। শুধুই মনে হইয়াছে সে নাই...সে নাই...কত দিনের কত বকুনি অপমান, কত না মেটা সাধ লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে... নিশ্চিন্দিপুরের বনে জঙ্গলে, ঝোপেঝাপে, পথের ধুলায় সর্বত্র যে দিদির পায়ের দাগ...দিদি এতদিন মরিয়া গেলেও দুজনের খেলা

করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন কাছে কাছে পাইয়াছে, আজ সত্যসত্যই তাহার সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল...সে বোঝে তাহার দিদিকে আর কেহ যেন ভালোবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে দুঃখিত নয়। তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা উচ্ছ্বসিত চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল—ভাবিসনে দিদি, আর কেউ না থাকুক, আমি আছি, আমি তোকে কক্ষনো ভুলবো না।

সত্যই সে ভুলে নাই। উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল—কিন্তু দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে গাড়ির বেগ যখন খুব বেশি, মাঠ মিলাইয়া যায়, এক্সপ্রেস ট্রেনের দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া সে পাদানির উপর পা রাখিয়া বসিয়া পড়িত—সে উড়িয়া চলিয়াছে। সবুজ গাছপালা খাল, নদী, বন, পাহাড়, কাঁকর-ভরা ঊষর জমির উপর দিয়া, নীল হাওয়া-ভরা শূন্য বাহিয়া, সে উড়িয়া চলিয়াছে অস্তসূর্যের পারের কোন মায়ালোকের দিকে মাথার উপর তাহারই মতো অশান্ত এক-আধটা পথিক-তারা।...

যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নূতন নূতন মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো বিশাল তুষারমৌলি ফুজিসান কি দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত অন্য কোনো নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীয়মান চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের নীলবেলা এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মতো মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে,—তখনই, এইসব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘন বর্ষার রাতে, [এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে,] অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, এক পুরনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ের কথা—[তার নাটা ফলের পুঁটুলি, তার সযত্নসঞ্চিত রড়ার বীচিগুলা, তার ভাঙ্গা পুতুলের বাক্স। তার গরিব দিদিকে জীবন এর বেশি কিছু দান করেনি।]

অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

অপুর বাল্যজীবন

টীকা

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কিছু আংশ, তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বের কিছু চিহ্ন 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতিরচনাবলী'র (শ) পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে ছাপা হয়েছে। আরো আগে 'পথের পাঁচালী' হীরকজয়ন্তী সংস্করণ'-এ পাঠক পথের পাঁচালী" উপন্যাসের এমন খসড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, যা নাকি প্রকাশিত উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বদলেছেন, অথবা অনেকখানি বর্জন করেছেন। বর্তমান খণ্ডে অপ্রকাশিত বা পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির যে অংশগুলি সাজানো হল, তাকে 'পথের পাঁচালী'র বর্জিত অংশ না বলে, উপন্যাসটি রচনার মহলা বলাই সঙ্গত হবে। মূলত, "আম-আঁটির ভেঁপু"র কয়েকটি বিন্যাস গড়ে ওঠার কাহিনী এখানে থাকল। তবে এই নির্দিষ্টতা খুব নিশ্চিত নয়। কারণ দেখা গেছে, "আম-আঁটির ভেঁপু" বলে যাকে আমরা চিনি, তার খসড়া করতে করতে বিভূতিভূষণ হঠাৎ চলে গেছেন 'অপরাজিত'র ছকে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' নামকরণও তখনো তার আয়ত্তে নেই। খসড়ায় তিনি Apu I, Apu II—এই নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। আবার "আম-আঁটির ভেঁপু"র চেনা পাঠে এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির যে অংশ বর্জিত হয়েছে, তার চিহ্ন ছড়িয়ে গেছে কখনো "অক্রূর সংবাদ"-এ, কখনো "বল্লালী-বালাই"তে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এইসব পাতা বিভূতিভূষণ নিজের জন্যে

লিখেছিলেন। পাঠকের মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যক্ষ মাধ্যম হিসেবে এই পৃষ্ঠাগুলি নিশ্চয় অনুপযুক্তই ঠেকেছিল তাঁর কাছে। তাই উপন্যাসের পরিচিত চেহারায় পৌঁছতে এত ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন।

এই পাতাগুলির তিনটি ছাড়া কোনোটিরই কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই। একটি পাতা পড়বার পরে কোন পাতাটি পড়ব, সেই ক্রমও পাঠককেই বানিয়ে নিতে হয়েছে। কোনো পৃষ্ঠা লিখবার পরে বিভূতিভূষণ একটানে পুরোটাই কেটে দিয়েছেন। কখনো বা পাতার উপরে লিখেছেন 'Cancelled'। তাছাড়া লেখার ভিতরে ভিতরে কোনো শব্দ অথবা বাক্য কেটে আরো উপযোগী ভাষা অথবা বয়ান খুঁজেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কাটাকুটির তলা থেকে, প্রথমে তিনি কী লিখেছিলেন, তা পড়া যাচ্ছে। যেহেতু এই বর্জিত পাণ্ডুলিপির পাতাগুলিকে আমরা 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে দেখতে চাইছি, কেটে দেওয়া অংশগুলিও, যতটুকু উদ্ধার করা গেল, তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে [ ] দেওয়া হল। যেখানে যেরকম বানান তিনি লিখেছিলেন, তা অপরিবর্তিত থাকল। তাই একই শব্দের একাধিক বানান পাঠক দেখতে পাবেন। যেখানে যেখানে বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষর পড়া যায়নি, সেখানে ***চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। চার, পাঁচ আর ছয় শীর্ষক অংশ বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে লিখেছিলেন, শুরুতে Bha এরকমই নির্দেশ করে। আরো অনেক খসড়াই হয়তো ভাগলপুরে বসে করা। এই পাতাগুলিতে বিভূতিভূষণের বিহার-প্রবাসের তুলনামূলক স্থায়ী আবাস বড়বাসার উল্লেখ আছে। আছে কাছারির কাজে যে ইসমাইলপুরে গিয়ে থাকতে হতো, তারও উল্লেখ।

এক শিরোনামে যে অংশটি আছে, তাকে 'পথের পাঁচালী'উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের প্রস্তুতি হিসেবে চেনা যায়। পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠার উপরে বিভূতিভূষণ লিখেছেন ২২। এই ২২ পৃষ্ঠাসংখ্যা কিনা, সে কথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ তার ঠিক আগের অথবা ঠিক পরের পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের শুরুর (শ ১, পৃ ৩১-৩২) সঙ্গে পৃষ্ঠাটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শেষপর্যন্ত এই ২২ চিহ্নিত পাতাটিতে লেখা অনেকখানি অংশই বিভূতিভূষণ বাদ দিয়েছিলেন। হয়তো পরিত্যক্ত এই পৃষ্ঠাটি পড়তে পড়তে অথবা লিখতে লিখতেই তিনি ভেবেছিলেন, কেমন করে আরো কম লিখে আরো বেশি বলা যায়।

দুই চিহ্নিত অংশটি শুরু হচ্ছে একটি বাক্যের মাঝখানে। শেষও একটি সংলাপের মধ্যপথে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। বিভূতিভূষণের হাতে লেখা যে দুটি পাতা মিলে **দুই** তৈরি হয়েছে, তার একটিরও পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল না। শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমার হাতে যখন পাতাগুলি এসেছিল, তখন তা পরপর সাজানো ছিল না। এই অংশে ব্যবহৃত প্রথম পাতাটির শেষে ছিল 'তাহাদের [গ্রামের] গ্রামটা বাঁশবনে, আমবনে, গাছপালায় এত চাপা যে'। অন্য একটি পৃষ্ঠার শুরুতে পেয়েছি 'খোলা আকাশের সহিত অপুর এতদিন পরিচয় হয় নাই। দুটি পৃষ্ঠা মিলিয়ে **দুই**-এর ক্রম বানিয়েছি। অংশটিকে 'পথের পাঁচালী'র ষোড়শ পরিচ্ছেদের প্রস্তুতি বলে মনে হয়। বাবার সঙ্গে শিষ্যবাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট আহার্য পেয়ে অপুর বিস্ময়, তার দিদি এসব কিছুই খেতে পেল না বলে, অথবা অমলাদিদির মতো খেলনা দিদির একখানাও নেই বলে অপুর বেদনা, অপুর সদ্যভ্রমণের পথটির বর্ণনা সবই অনেক ঋজু, পরিণত মোচড়ে বিভূতিভূষণ উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে (শ ১, পৃ ৬১-৬২, ৬৩, ৬৪) ফুটিয়ে তুলেছিলেন। **দুই**-তে আমরা উপাদানগুলিকে প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্বে শনাক্ত করতে পারি। কিন্তু এখানে অপুর গায়ে যে সাটিনের জামাটি আছে, তা অবশ্য 'পথের পাঁচালী'র ষোড়শ পরিচ্ছেদে নেই। উপন্যাসে তা আছে অনেক পরে, অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে, যখন অপু গঙ্গানন্দপুরে পিসিমার বাড়িতে একা গিয়েছিল। ফিরবার পথে গুল্‌কী তাকে এগিয়ে দিতে আসে 'গুল্‌কী' মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই আঙা জামাটা ক'পয়সা?' (শ ১, পৃ ১৩৬)।

দুই শীর্ষক অংশেই অপুর এই ভ্রমণের সুবাদে শিশু অপুর জীবনে প্রথম খোলা আকাশ দেখার যে গল্পে বিভূতিভূষণ ফিরে গিয়েছিলেন, প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'তে তার অনুরূপ কোনো বিন্যাস খুঁজতে পাঠককে পিছিয়ে

যেতে হবে চতুর্থ পরিচ্ছেদের গোড়ায়, অর্থাৎ "বল্লালী বালাই"তে। সেখানে দশমাসের খোকা অপুর 'জে-জে-জে...'গানে (শ ১, পৃ ১১, ১২) এই বর্জিত অংশটির রেশ খোঁজা যায়। পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখছি, বালক অপুর আনন্দ-বিস্ময়-চিন্তার সূত্রে একবছরের শিশু অপুর অভিজ্ঞতার গল্প এসে পড়েছে। এটা যে বাস্তবসম্মত নয়, তা মনে হওয়া বিভূতিভূষণের পক্ষে স্বাভাবিক। যখন অপুর জে-জে গানের বয়স, তখন উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে সে দ্রষ্টা হতে পারে না—দ্রষ্টব্য হতে পারে মাত্র। প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে সেরকমই ঘটেছিল। দ্রষ্টার ভূমিকায় সেখানে আছে সর্বজয়া এবং পরে হরিহর।

তিন-এর অংশটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই অসম্পূর্ণ, কোনো পৃষ্ঠারই ঠিক আগের অথবা ঠিক পরের পাতা পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকটি ভাগেরই কেন্দ্রে আছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ, গোকুলের বৌ নামেই উপন্যাসে তার পরিচয়। প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'তে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের অনেকখানি জুড়ে আছে এই চরিত্র। দুর্গার সঙ্গে তার এই গ্রামসম্পর্কে খুড়িমাটির বড় উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটির হেনস্থার শেষ ছিল না। অন্নদা রায়ের যে জ্ঞাতিপুত্র পিতার অনুরোধে নিশ্চিন্দিপুরের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিতে এ গ্রামে এসেছে, সেই নীরেন্দ্রের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের কথা এই খুড়িমাই প্রথম তুলেছিল। নীরেনের সঙ্গে তার এই জ্ঞাতিবৌদির একটা হাসিঠাট্টার সম্পর্ক গড়ে উঠতেও 'পথের পাঁচালী'র পাঠক দেখেছিলেন।

তিনক পাতাটির কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই। তাকে চিহ্নিত করা যায় 'পথের পাঁচালী'র সপ্তদশ পরিচ্ছেদের একটি অংশের (শ ১, পৃ ৭৭) প্রস্তুতি হিসেবে। পরিত্যক্ত পৃষ্ঠাটির আখ্যানবস্তু সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে, অনেকটা আঁটোসাঁটো বুনোটে উপন্যাসে আছে। তবে পাথরকুচির পাতা বাটা দিয়ে ঘা সারানোর প্রসঙ্গটি সপ্তদশ থেকে ষোড়শ পরিচ্ছেদে চলে গেছে। পাত্র-পাত্রী-পরিবেশ সবই সেখানে আলাদা। 'পথের পাঁচালী'র পাঠকের মনে পড়বে, বাবার সঙ্গে লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়িতে থাকাকালীন অপুর একবার পায়ের আঙুল কেটে গিয়েছিল খেলতে খেলতে। অমলা এসে বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে আটকানো আঙুল তাড়াতাড়ি বের করেছিল। গোলার পাশ থেকে পাথরকুচির পাতা তুলে, তা বেটে, বেঁধে দিয়েছিল অপুর আঙুলে (শ ১, পৃ ৬২)।

তিনখ অংশটি যে পাতায় আছে, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু তা ১৪১ না ১৪৪, সেটা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখানে উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অন্তিম লগ্নটি (শ ১, পৃ ৭৮-৭৯) তৈরি হচ্ছে। গোকুলের বৌ-এর বেদনার সারকথাটুকু এই পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত উপন্যাসে বদলায়নি। তার গ্রন্থনা অবশ্য আরো পরিণত হয়েছে। কেবল গোকুলের বৌ-এর স্মৃতিতে যে বাল্যসখী হিমিদির কথা আছে, সে পাণ্ডুলিপি থেকে উপন্যাসের মূল চেহারায় আসতে হারিয়ে গেছে। অনেক পরে, 'অপরাজিত' উপন্যাসে, সর্বজয়ার বাল্যসখী এক হিমিদির উল্লেখ আছে, যার কথা সর্বজয়ার মনে এসেছিল মৃত্যুর ঠিক আগে ('অপরাজিত', নবম পরিচ্ছেদ, শ ২, পৃ ১০১)। এই পৃষ্ঠায় বিভূতিভূষণ যেন একটি পরিচ্ছেদ শেষ করে অন্য একটি পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন। ১৪১ অথবা ১৪৪ পৃষ্ঠার ওই দ্বিতীয় অংশটি অপু আর নীরেনকে নিয়ে। উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পাঠক দেখেছিলেন, জেলেপাড়ায় কড়ি খেলতে গিয়ে অপু আর পটু ঝামেলায় পড়লে, নীরেন এসে তাদের বাঁচায়। 'পথের পাঁচালী'তে আছে, 'এতদূরে ঠিক দুপুরবেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দুজনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দুজনকেই বার বার বলিল।' (শ ১, পৃ ৮০)। এর সঙ্গে ১৪১ (অথবা ১৪৪) পৃষ্ঠার অপু-নীরেন বিনিময়ের কোনো প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য নেই। তবে নীরেন যে অপুকে বলে, 'খোকা সেই ছড়াটা বলো তো?—সেই মশারির সেইটে—', এরকম কোনো অনুরোধ প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'তে নীরেনের কাছ থেকে আসেনি ঠিকই; কিন্তু মশারির ছড়া হারিয়ে যায়নি। অনেক পরে, উপন্যাসের চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ

"অক্রূর সংবাদ" অংশে অপু লীলাকে শুনিয়েছিল, যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে/তাকে খাট-পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?', (শ ১, পৃ ১৬৯)। তিন খ অংশটি যে পৃষ্ঠায় লেখা, সেই পাতার উপরে বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছেন 'Cancelled"।

তিন গ অংশের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৩। এই পাতাটির উপরেও বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষরে 'Cancelled'লেখা আছে। কিন্তু নীরেন আর গোকুলের বৌ-এর এই সংলাপের বেশ খানিকটা অংশ পথের পাঁচালী'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে প্রায় অপরিবর্তিত পাওয়া যায় (শ ১, পৃ ৮৪)। তবে পরিত্যক্ত পাতাটিতে যা ছিল নীরেনের প্রতি দুর্গাকে বিয়ে করার অনুরোধ, অথবা তেমন কোনো অনুরোধের উপক্রমণিকা, উপন্যাসে তা বদলে গেল। সেখানে কথোপকথনের সূত্রে বৌদি নীরেনের কাছে কানের গয়না গচ্ছিত রেখে পাঁচটা টাকা চায়, হতভাগ্য ভাইটাকে পাঠাবে বলে। কিন্তু দুর্গার সঙ্গে নীরেনের বিয়ের প্রস্তাব যে গোকুলের বৌ-এর মনে তার আগেই এসেছে, এমন ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে (শ ১, পৃ ৭৭-৭৮)।

চার শীর্ষক অংশটির পরিণত অবয়ব 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে, গোকুলের বৌ আর নীরেনের পূর্বোক্ত আলাপের ঠিক পরেই (শ ১, পৃ ৮৫)। তবে রাণুর দিদির বিয়েতে লুচি খাওয়ার যে সুখস্বপ্ন দুর্গার, তা উপন্যাসে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক অংশটিতে অনুপস্থিত। অনায়ত্ত আহার্য নিয়ে দুর্গার না-মেটা-সাধের বিন্যাস আগেই গাঁথা হয়ে গেছে ষোড়শ পরিচ্ছেদে—শিষ্যবাড়িতে হরেকরকম খাবার নাগালে পেয়ে দিদির জন্য অপুর মন-কেমনে—"লুচি! লুচি! তাহার ও দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়...কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য তৈয়ারি বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধা-রুচি-ঘ্রাণ আসে...' (শ ১, পৃ ৬৪)। **দুই** শীর্ষক অংশটির সঙ্গেও এর-সাদৃশ্য লক্ষণীয়।।

কিন্তু **চার**-এর পরে কেন হঠাৎ 'বর্ণনাবলী' শিরোনামে লেখা বিভূতিভূষণের সাহিত্য-পরিকল্পনার আরো প্রাথমিক নথিকে (যা চরিত্রগত ভাবে **এক দুই তিন চার** শীর্ষক টানা পাণ্ডুলিপির বিক্ষিপ্ত অংশগুলির থেকে আলাদা) **পাঁচ** হিসেবে আনলাম, তা নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। লক্ষণীয় যে **চার** শীর্ষক অংশটির উপরে বিভূতিভূষণের হাতে লেখা তারিখ ১৯২৬-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি; আর টানা পাণ্ডুলিপি শুরু করার আগে তিনি নিজেকে আরো একটি নির্দেশ দিচ্ছেন—'To be preceded by a chapter of pure narration'যাকে আমরা **পাঁচ**নামে নির্দেশ করছি, তার তারিখ ১৯২৬-এর ২০ ফেব্রুয়ারি। যে 'narration'-এর অধ্যায় চার-এর আগে আনতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, তারই কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঠিক দু'দিন পরে? অথচ 'পথের পাঁচালী'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের যে অংশকে **চার**-এর পরিণত চেহারা বলা যায়, তার আগে উপন্যাসে কোনো 'pure narration'-এর 'chapter' নেই। খসড়াতেও দেখছি, বিভূতিভূষণ হঠাৎ 'বর্ণনাবলী' ভেঙে পৌঁছে গেছেন দুর্গার মৃত্যুর প্রস্তুতিতে। আর সেই প্রস্তুতি, যাকে প্রায় খসড়াও বলা যায় না, বলা যায় সাহিত্যিকের পরিকল্পনার প্রাথমিক নথি মাত্র, তারই ভিতরে লেখক পেয়ে গেছেন দুর্গার মৃত্যু-পরবর্তী সেই অমোঘ বাক্য—'দুর্গা আর চাহিল না'। ('পথের পাঁচালী', পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, শ ১, পৃ ১১৬)। পেয়েছেন, রেলগাড়ি নিয়ে দুর্গার না-মেটা-সাধের হদিস।

দুর্গা যখন রাণুর দিদির বিয়ের সূত্রে নিজের বিয়ের স্বপ্ন দেখছে, (এবং সেই বিয়ের ব্যাপারে প্রাথমিক আগ্রহ যখন দুর্গার সাধের খুড়িমার), তখন থেকেই কি বিভূতিভূষণের মনে দুর্গার মরণের উপক্রমণিকা গুমরে উঠছে? দুর্গা যদি বাঁচে, যদি সাবালিকা হয়, যদি নীরেনের মতো কারো সঙ্গে বিয়ে হয় তার, তবে খুড়িমার অথবা নিজের মায়ের জীবনকে, ভবিতব্যকে সে আর কতটুকু পেরোতে পারবে? যদি না পারে দুর্গা, তবে বিভূতিভূষণ কি পারবেন তাঁর

দুর্গার অত মলিনতা সইতে? তাই কি 'বর্ণনাবলী' ভেঙে তিনি চলে যান দুর্গার মৃত্যুর সন্ধানে? **পাঁচ** শীর্ষক অংশটির কতখানি ১৯২৬-এর ২০ ফেব্রুয়ারিতে লেখা, আর কোনখান থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারির লেখা, সে ব্যাপারে কোনো বিভাজন অসম্ভব। বিভূতিভূষণ যেখানে যেভাবে তারিখ দিয়েছেন, সেইভাবেই ছাপা হল। **ছয়** বলে যে অংশটি নির্দেশ করেছি, তাকেও টানা পাণ্ডুলিপি বলা যায় না। শৈশবে যে অপু একবার হারিয়ে গিয়েছিল, এ ঘটনা 'অপরাজিত' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের (শ ২, পৃ ৩৯) আগে পাঠক জানতে পারেন না। **ছয়**-তে আরো আছে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে যেন নিজের সঙ্গেই লেখকের কিছু পরামর্শ। 'কি অনন্ত রহস্য...তাহার বয়স ছয়'—এই দুটি অনুচ্ছেদের দুদিকে তিনি লিখে রেখেছেন 'Imp'। তারপর আবার ফিরে গেছেন সেই অবিশ্রান্ত বর্ষার দিনে, যার পরেই দুর্গার মৃত্যু। অর্থাৎ আবার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদটির কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। পাতাটির উপরে বিভূতিভূষণের হস্তাক্ষরে লেখা আছে 'utilized'

সাত-এর পরিণত অবয়ব মিলবে 'পথের পাঁচালী'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের একেবারে শেষে (শ ১, পৃ ৮৯)। সে অর্থে **সাত চার**-এর পরেই আসতে পারত। কিন্তু ফেব্রুয়ারির ১৮, ২০, ২৩ তারিখের ক্রম, আর নিজের বিয়ে নিয়ে দুর্গার প্রথম কল্পনাকে আর দুর্গার মরণের নিয়তিকে মিলিয়ে পড়া—দুয়ে মিলে বর্তমান গ্রন্থনাটি তৈরি হল। **ছয়**-এর অংশ লেখা হয়েছে ১৯২৬-এর জুলাই মাসের ২৩ আর ২৮ তারিখে। সেখানেও তো দিনলিপি রচনার ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাসের এলোমেলো ছক শেষ পর্যন্ত বিভূতিভূষণকে পৌঁছে দিচ্ছে দুর্গার মৃত্যর দোরগোড়ায়। **সাত** নম্বর অংশে দুর্গার দুটি আকাঙ্ক্ষা যেন নীরেনের সঙ্গে বিবাহে ভর করে পূর্ণতার স্বপ্ন দেখছে। একটি রেলগাড়িতে চড়া, অন্যটি নানান সুখাদ্য নিজের নাগালে পাওয়া। সুখাদ্যের বর্ণনায় ঘি বস্তুটির বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করবার মতো। আর ঘি তো এমন একটি উপকরণ, সর্বজয়ার দরিদ্র গৃহস্থালি যার মুখ আদৌ দেখে না। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের শেষে দুর্গার রেলগাড়ির স্বপ্ন এই বর্জিত পৃষ্ঠাটি থেকে বিশেষ বদলায়নি। কিন্তু সুখাদ্য আর ঘি-এর প্রসঙ্গটি হারিয়ে গেছে। অথবা বলা ভালো, উপন্যাসে তা আগেই গ্রথিত হয়েছে ষোড়শ পরিচ্ছেদে, যখন লক্ষ্মণ মহাজনের ভায়ের বৌ-এর দেওয়া মোহনভোগ খেতে খেতে অপু অবাক হয়েছিল—'একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়...বাড়িতে...তাহার মা... শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া...দেয়...এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ! (শ ১, পৃ ৬২)।

আট শীর্ষক অংশটি থেকে পৌঁছানো যায় 'পথের পাঁচালী'র দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের শেষে (শ ১, পৃ ১০১) এবং এয়োবিংশ পরিচ্ছেদের অংশবিশেষে (শ ১, পৃ ১০৩-৪, ১০৬)। এই পৃষ্ঠায় বিভূতিভূষণ পাশাপাশি দুই কলামে খসড়া করেছেন। প্রথম কলামের উপরে লেখা আছে 'Utilized in Apu I'। এই খসড়া করবার সময় পর্যন্ত অজয় সম্ভবত তৈরি হয়নি। এখানে জীবনকেতু (এই চরিত্রটিই উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে বিচিত্রকেতু হয়ে গেছে) এবং জীবনকেতু চরিত্রের অভিনেতাকে নিয়ে অপু মাতোয়ারা। আবার এই খসড়া করতে করতে বিভূতিভূষণ যেন চলে যান জীবনদর্শনে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে; যেন উপন্যাসের খসড়া হয়ে ওঠে বিভূতিভূষণের সন-তারিখহীন দিনলিপির একটি পাতা। তারপর দেখি একই পাতায় 'অপরাজিত'র পরিকল্পনা। অপু যখন দেওয়ানপুরে হাইস্কুলে পড়ত, তখনকার বর্ণনায় আছে, কোন কিছু ভালমন্দ জিনিস পাইলে সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল।' ('অপরাজিত', তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ ২, পৃ ৩৯)। এমন বিন্যাসের প্রস্তুতিকে একভাবে খুঁজে নেওয়া যায় **আট**-এর শেষে 'Apu II' শীর্ষক পরিকল্পনার নথিতে।।

নয় শীর্ষক অংশটিকে বলা চলে 'পথের পাঁচালী'র পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের দু-একটি মুহূর্তের প্রস্তুতি। উপন্যাসে কোনো পালিত-পিসি নেই। তবে ঘন বর্ষার দিনে সর্বজয়া ঘাটে নাপিত-বৌয়ের কাছে কাঁসার রেকাবি বিক্রি করেছিল; 'অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে। (শ ১, পৃ ১১১)। পাণ্ডুলিপির যে পরিত্যক্ত পৃষ্ঠাকে আমরা **নয়** বলে নির্দেশ করেছি, সেখানে পালিত-পিসি আর সর্বজয়ার বিনিময়ে উপরের অংশটির আভাস মিলবে। উপন্যাসের একই পরিচ্ছেদে নিবারণের মায়ের কাছে সর্বজয়া আধকাঠা চাল চেয়েছিল 'বিন্দাবুনি চাদর'-এর বদলে (শ ১, পৃ ১১৩)। বর্জিত অংশটিতে পালিতপিসি নিবারণের মৃত্যুর যে গল্প বলছে, তা 'পথের পাঁচালী'উপন্যাসে নেই। "বল্লালী-বালাই" অংশে ইন্দির ঠাকরুনের স্মৃতিতে এক নিবারণ এসেছিল; সে ব্রজ চক্রবর্তীর ছেলে। তরতাজা জোয়ান মাত্র ষোলো বছর বয়সে অসুখে ভুগে মারা যায় ('পথের পাঁচালী', তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ ১, পৃ ১১)। পালিতপিসির গল্পের নিবারণ আর উপন্যাসে ইন্দির ঠাকরুনের স্মৃতির নিবারণ দুটি আলাদা চরিত্র। যে নিবারণের মায়ের কাছে সর্বজয়া উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে চাল চেয়েছিল,সেই নিবারণ এবং উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ব্রজ চক্রবর্তীর ছেলে নিবারণও এক লোক নয়। **নয়** চিহ্নিত অংশের অনেকখানিই যে বিভূতিভূষণ বর্জন করেছেন, তার প্রমাণ তো তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরকার দীর্ঘ অংশগুলিতেই মিলবে।

দশ শীর্ষক অংশটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দুটি ভাগকেই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদের প্রস্তুতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসে আছে, 'তাহার (অপুর) বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে... তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মতো তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা'। (শ ১, পৃ ১২১)। এই সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদের সর্বজয়ার প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'তাহাদের যে-সব শিষ্যবাড়ি আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে-সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা... গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে...দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়...এইটাই বর্তমানে তাহার (সর্বজয়ার) সব চেয়ে উচ্চ আশা। (শ ১, পৃ ১২১-২২)। একই পরিচ্ছেদে আছে অপু আর পটুর নৌকো বাইতে বাইতে গান গাওয়ার ঘটনা (শ ১, পৃ ১২৯-৩০)। সুতরাং **দশ ক** অংশটির সারবস্তু যে উপন্যাসে গৃহীত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপুর 'মায়ের প্রস্তাব', বাবার এনে দেওয়া 'নেপোলীয়ন বোনাপার্ট', পটুর মুগ্ধতা, কিছুই উপন্যাসে পুরোপুরি বর্জিত হয়নি।

কিন্তু **দশখ** এমন একটি অংশ, যা উপন্যাসে পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে। অপুর জ্ঞাতি জ্যাঠামশায় নীলমণি রায়ের পুত্র সুরেশ 'পথের পাঁচালী'র সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম এসেছিল ঠিকই। কিন্তু তার চিত্রণ সেখানে **দশখ** থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুরেশ কোনোদিনই গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থালির সন্তান অপুকে, তখনো পর্যন্ত ইংরেজি স্কুলের মুখ-না-দেখা অপুকে তেমন পাত্তা দেয়নি। 'পথের পাঁচালী'তে লখাই নামের কোনো বন্ধুও অপুর ছিল না। অপুও নিশ্চিন্দিপুরে কখনো প্রথম মহাযুদ্ধের খেলায় মাতেনি। "আম-আঁটির ভেঁপু"তে তার খেলা কুরুক্ষেত্র পেরিয়ে বেশিদূর এগোয়নি। বিভূতিভূষণের কি মনে হয়েছিল যে "আম-আঁটির ভেঁপু"র অভ্যন্তরেই যদি অপুর খেলার জগৎ মহাভারতের মহাযুদ্ধ থেকে বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, তবে 'অপরাজিত'তে পৌঁছতে পৌঁছতে অপূর্বকুমারের সাবালক খেলাধুলোয় কিছু বেশি পুনরুক্তি ঘটে যাবে? এখনো পর্যন্ত পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির যতগুলো টুকরো আমরা দেখলাম, তার মধ্যে একমাত্র **দশ খ**-ই উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত।

এগারো-র অংশের জন্য বিশেষ কোনো টীকার প্রয়োজন নেই। "আম-আঁটির ভেঁপু"র অন্তিম মুহূর্তকে অনায়াসে এখানে শনাক্ত করা যায় ('পথের পাঁচালী', ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ, শ ১, পৃ ১৪২-৪৩)। লক্ষণীয় যে **এগারো** শীর্ষক পাণ্ডুলিপির পাতাটিতে "আম-আঁটির ভেঁপুর অমোঘ শেষ বাক্যটি বিভূতিভূষণের আয়ত্তে এসে গেছে। কিন্তু ওই বাক্যটিতে পৌঁছনোর মনোমতো পথ তখনো তিনি পুরোপুরি খুঁজে পাননি। তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরের এবং বাইরের অংশগুলি পড়তে পড়তে পাঠক বুঝবেন যে, বিভূতিভূষণ ক্রমেই নিজের কাঙ্ক্ষিত বয়ানের কাছাকাছি আসছেন। তাঁর মতো ওস্তাদ বাঁশিওয়ালাও আম-আঁটির ভেঁপুতে একদিনে সুর ধরাতে পারেননি। বহু চর্চায়, অনেক শ্রমে, চিন্তা-অনুভব-অভিনিবেশের আশ্চর্য মেলবন্ধনে বিভূতিভূষণের ভাষা আড় ভেঙে ভেঙে নিজের পরিণত চেহারাকে আয়ত্তে পাচ্ছে। "আম-আঁটির ভেঁপু" নিয়ে বিভূতিভূষণের অতৃপ্তি তখনি শেষ হয়, যখন বেসুরের সামান্যতম রেশটুকু থেকেও তার ভেঁপুকে তিনি মুক্ত করতে পারেন।

শুধু **এগারো** নয়, প্রতিটি অংশই সুরযোজনার সেই সুদীর্ঘ এবং সহিষ্ণু প্রক্রিয়ার সাক্ষী।)

রুশতী সেন